আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা
১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ ১৬-৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬

মূল্য : ২০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

প্রতি সংখ্যা ২০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৫০০ টাকা
এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা ১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৯,
১৬-৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
Vol. 7, Issue 23nd, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি: দীপ্ত দাশগুপ্ত
(শিল্পীর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *সেই দিনগুলো* থেকে গৃহীত)

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা
বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সম্পাদকীয়
গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রা ৫
স্পর্ধার নাম জেএনইউ ৬

সমসাময়িক
দেশের নিলাম চলছে ৯
মোদীর বলসোনারো প্রীতি ১১
সুপ্রিম ও সুপ্রিমো ১২

বিদ্যাসাগরের আয়নায় বাঙালি
অনুরাধা রায় ১৪

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে
পেরেস্ত্রৈকার শেষ বছর
অরুণ সোম ২৫

অযোধ্যা রায়— অসাংবিধানিক
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ২৯

জেএনইউ ছাত্রবিক্ষোভের নেপথ্যে
তেজস্বী রায় ৩২

কচভাইদের নিয়ে কিঞ্চিৎ কচকচানি
অমিতাভ রায় ৩৬

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: রাজনৈতিক বিতর্কের রূপরেখা
শৌভিক চক্রবর্তী ৩৯

পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ
সমর বাগচী ৪৩

নখাগ্রে নক্ষত্ররাজি
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৭

গৌরী বসু— বিস্মৃত এক নাম
নূপুর সেনগুপ্ত ৫১

চিঠির বাক্সো ৫৪

পুনঃপাঠ
ধর্মতলায় কর্ম খালি
নবনীতা দেব সেন ৫৬

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা

দুই বছর : ৫০০ টাকা

তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ, উৎসা পট্টনায়ক, বি. রঘুনন্দন

সি. পি. চন্দ্রশেখর, জয়তী ঘোষ, বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট

নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রা

মহারাষ্ট্রে সরকার গড়াকে কেন্দ্র করে যেই কু-নাটকটি রচিত হয়েছে তা দেখে বোঝা যায় যে ভারতের রজনীতিতে নীতি-আদর্শ-নৈতিকতা-সততা জাতীয় কথাগুলির আর কোনো মানে নেই। এই কথাগুলির যে আগেও খুব মানে ছিল তা নয়, তবু একটু রাখঢাক ছিল। কিন্তু বিগত ২০ বছর ধরে এই কথাগুলিকে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজনীতিবিদরা হত্যা করেছেন। মহারাষ্ট্রে যা ঘটেছে তা এই হত্যালীলার নবতম সংযোজন।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি ও শিবসেনা জোট করে নির্বাচন লড়েছিল। মোট ২৮৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১০৫টি আসন এবং শিবসেনা ৫৬টি আসন জেতে। অর্থাৎ দুই দল মিলে অনায়াসেই সরকার গড়তে পারত। কিন্তু বাধ সাধল শিবসেনা। তারা হঠাৎ দাবি জানাল যে মুখ্যমন্ত্রীর আসন মেয়াদের অর্ধেক সময় তাদের চাই। দুই হিন্দুত্ববাদী দীর্ঘদিনের বন্ধুর ক্ষমতা নিয়ে বিবাদ পাড়ার মোড়ের ঝগড়ায় পর্যবসিত হল এবং সরকার গড়তে তারা ব্যর্থ হল। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবত হল।

মানুষ ভেবেছিল যে তারা একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল যে সরকার হচ্ছে না কারণ শরিকদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে কোন্দল। এই সুযোগে মাঠে নামলেন মহারাষ্ট্রের বহু যুদ্ধের সৈনিক শরদ পওয়ার। কথা শুরু করলেন শিবসেনা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে। তিনটি দল একে অপরকে সমর্থন করলে সরকার তৈরি করা যায়। হিন্দুত্ববাদী শিবসেনা যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অন্যতম কাণ্ডারী, যাদের তত্ত্বাবধানে মুম্বাই শহরে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল, যাদের উগ্র জাতীয়তাবাদের বলি হয়েছে মুম্বাইয়ের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, মুম্বাই বসবাসকারী দক্ষিণ ভারত ও বিহারের শ্রমিক শ্রেণি, তারা কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে হঠাৎ হয়ে উঠলেন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিমূর্তি। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব শিবসেনার সঙ্গে জোটকে সবুজ সংকেত দিলেন। কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে ভবিষ্যতের গবেষকরা গবেষণা করার অনেক খোরাক পেলেন। কারণ দেশের পশ্চিম প্রান্তে কংগ্রেস হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ত শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বিজেপিকে রোখার উদ্দেশ্যে আবার দেশের পূর্ব প্রান্তে, পশ্চিমবঙ্গে, কংগ্রেস বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ বিজেপি ও তৃণমূলকে হারানোর উদ্দেশ্যে। ফ্যাসিস্ত এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে একই সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে এই দল। বামপন্থীদেরও ভাবা উচিত কাদের সঙ্গে জোট করছেন তারা, যারা ক্ষমতার জন্য দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, নীতি-আদর্শকে বিসর্জন দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে না?

অবশ্য কংগ্রেসের ক্ষমতার ভাগীদার হওয়ার স্বপ্নে জল ঢেলে দেয় এই মুহূর্তে দেশের শাসক দল যারা ক্ষমতার

জন্য যেকোনো নীচ কাজ করতে পারে, নর্দমার পাঁকের যেকোনো গভীরতায় নিমগ্ন হতে যারা ভাবে না। ২২ নভেম্বর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস, শিবসেনা এবং এনসিপি ঘোষণা করে যে তারা শিবসেনার নেতৃত্বে সরকার গড়বে। দেশের মানুষ সেই রাত্রে এই কথা জেনেই ঘুমোতে যান। কিন্তু ২৩ নভেম্বর সকালে উঠে তারা জানতে পারলেন খেলা পালটে গেছে, এনসিপি-র অজিত পওয়ারের নেতৃত্বে দল বিভাজিত হয়ে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়ে বিজেপি-র নেতৃত্বে সরকার গড়ছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্য রাত্রে নেহরু গোটা বিশ্বকে বলেছিলেন পৃথিবী যখন নিদ্রায় নিমগ্ন ভারত তখন স্বাধীনতার আলোয় জাগ্রত হচ্ছে। আজ বেঁচে থাকলে তিনি দেখতে পেতেন স্বাধীন ভারতে রাতের অন্ধকারে সেই ভারতের মহান সংবিধানকে কীভাবে ভূলুণ্ঠিত করছে বিজেপি। ভোর ৫.৪৭ মিনিটে ভারতের রাষ্ট্রপতি মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসন বিলোপ করেন এবং ৭.৫০ মিনিটে দেবেন্দ্র ফডনবীস এবং অজিত পওয়ার শপথ নেন। মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রপতি শাসন বলবত করা বা তাকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা। তেমন কোনো সভা হয়নি, প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন সরিয়েছেন যাতে বিজেপি রাতের অন্ধকারে সরকার গড়তে পারে। রাজ্যের রাজ্যপাল সেখানে বিজেপি-র দলদাসের মতন কাজ করেছেন, শাসক দল নির্দেশিত পথেই তিনি চলেছেন এবং সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য অঢেল সময় দিয়েছেন।

প্রশ্ন গণতন্ত্রের। একটি নির্বাচন হয়েছে কিছু দাবি ও প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। বিজেপি প্রচারের সময় বলেছিল যে ক্ষমতায় এলে তারা অজিত পওয়ারকে জেলে পুরবে, বলা হয়েছিল যে এনসিপি দলটি আপাদমস্তক একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল। অথচ, সেই এনসিপি-র নেতা অজিত পওয়ার এখন তাদের সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে অজিতবাবুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলার ফাইলগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অজিত পওয়ার একদিকে বলছেন তাঁর সঙ্গে ৫৪ জন বিধায়ক রয়েছে, অন্যদিকে শরদ পওয়ার দাবি করেছেন অজিত মিথ্যা বলছেন এবং এনসিপি বিধায়করা তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন। কে কার সঙ্গে রয়েছেন তা যেহেতু পরিষ্কার নয়, তাই সব রাজনৈতিক দল তাদের বিধায়কদের বিভিন্ন হোটেলে এনে রেখেছে। গণতন্ত্রের সর্বশেষ ভরসাস্থল এখন হোটেল যেখানে আপনার ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অন্য দলে যাতে না চলে যান তার পাহারা দেওয়া হচ্ছে। নেপথ্যে চলছে কোটি কোটি টাকার খেলা। নিলাম হচ্ছে গণতন্ত্র, রাজনীতি পয়সা কামানোর শর্টকাটে পর্যবসিত, জনগণ স্তব্ধ। জনসাধারণের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে কিন্তু সরকার কে গড়বে তা নির্ভর করছে কোন দলের হাতে সবচেয়ে বড়ো টাকার ব্যাগ রয়েছে তার উপর। ভারতের গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রার শেষ অঙ্কটি এভাবেই রচিত হচ্ছে।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় এল যে অবিলম্বে বিধানসভায় ফডনবীশকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। বিজেপি-র ছক ছিল রাজ্যপালের দাক্ষিণ্যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য অনেক সময় নেবেন এবং সেই সুযোগে বিরোধী বিধায়ক কিনে তারা সরকার বানাবেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় সেই আশায় জল ঢেলে দিল। রায় আসার পরেই দেবেন্দ্র ফডনবীশ এবং অজিত পওয়ার মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাই সরকার গড়ার বল আবার শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেসের কোর্টে। বিজেপি ও শিবসেনার বহু পুরোনো জোট ভেঙে যাওয়ায় এনডিএ নিশ্চিতভাবে দুর্বল হল। গোয়া, হরিয়ানা, মণিপুরে যেই অসাধু উপায়ে বিজেপি সরকার গড়ে, মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সম্ভব হল না। সংবিধানকে ধ্বংস করার তাদের প্রচেষ্টা আপাতত বাধাপ্রাপ্ত হল। কিন্তু কংগ্রেস শিবসেনার মতন একটি হিন্দুত্ববাদী পার্টির সঙ্গে কতদিন এক নৌকায় চলতে পারবে তা ভবিষ্যত বলবে। মহারাষ্ট্রের কু-নাটকটির আপাতত সমাপন হলেও দক্ষিণপন্থার আগ্রাসনকে কতটা আটকানো গেল তার উত্তর সময়ের গর্ভে।

স্পর্ধার নাম জেএনইউ

চেন্নাই শহরের একটি স্কুলে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যেতে হবে ছেলেটিকে। স্কুলে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হল, 'আরে এখানে তো আগে এসেছি, যদিও তখন জায়গাটি অন্যরকম দেখতে ছিল'। স্কুলটি যখন বানানো হচ্ছিল তখন ছেলেটি তার বাবার সঙ্গে এখানে শ্রমিকের কাজ করত। আজ তারই শ্রমের

ফসল এই বাড়িতে বসে সে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা দেবে। ফল বেরোল। ছেলেটি সুযোগ পেল দিল্লি গিয়ে জেএনইউ-তে পড়ার। কিন্তু টাকা? জানা গেল ওখানে ফি খুব কম এবং গরিব ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। অতএব চলে গেল সে। কয়েক বছর পরে এই ছেলেটিই ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল। এখন সে মহারাষ্ট্রের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

এরকম অসংখ্য গল্প আপনি শুনতে পাবেন জেএনইউ-এর গঙ্গা ধাবায়, ঝেলম লনে অথবা কমল কমপ্লেক্সে। সেই গল্পগুলি ভেসে বেড়ায় গোটা ভারতে আর হাতছানি দিয়ে ডাকে গরিব, দলিত, আদিবাসী, প্রান্তিক ছাত্রদের— যদি নিজের জীবন উন্নত করতে চাও, যদি শিক্ষা পেতে চাও নামমাত্র টাকায়, যদি মর্যাদা পেতে চাও, যদি চাও যে তোমার পারিবারিক সম্পদ বা পদবি নয়, তোমার লেখা কবিতা বা রচনা বা গবেষণাপত্রই হোক তোমার একমাত্র পরিচয়, তবে এস জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এই টানে এবং নিজেদের যোগ্যতায় যারা জেএনইউ-তে গিয়ে পৌঁছয়, তারা দেখে গোটা ভারতের একটি ছোট্ট সংস্করণের সে অংশীদার হয়েছে। ভারতের বিবিধতা, তার শিল্প-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ১০০০ একরের ক্যাম্পাসের ভিতর এসে একত্রিত। বাঙালি ছাত্রের পরিচয় ঘটে লাদাখের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আগত দরিদ্র মেষপালকের সন্তানের সঙ্গে, অথবা দরিদ্র বিহারী ক্ষেতমজুরের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় কেরলের পাদ্রীর ছেলের। এমন বিভিন্ন পরিচয়, সহাবস্থান এবং সমন্বয় নিয়েই জেএনইউ-এর ছাত্রজীবন। অবশ্যই সেই জীবনে তর্ক-বিতর্ক রয়েছে, রয়েছে মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক ব্যবধান। তবু বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে সমস্ত বিতর্ক আলোচনার স্তরেই থাকে, সেই আলোচনায় অসম্মতি জানানোর অধিকারও থাকে। আর থাকে পড়াশোনা এবং জ্ঞান চর্চার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। তাই শত বিতর্কের মধ্যেও জেএনইউ ভারতের এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রাখে। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙে যেই ছাত্ররা তারাই আবার পরীক্ষার খাতায় নিজেদের প্রমাণ করে, গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে ভেঙে দেয় পুরোনো কোনো তত্ত্বের ভিত্তি।

তাহলে দেশের সরকারের জেএনইউ-এর উপর এত রাগ কেন? কী কারণে ক্রমাগত আক্রমণ চলছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে? আসলে জেএনইউ বরাবর শিক্ষা দিয়েছে যে ভারতের বিবিধতাকে রক্ষা করা এবং গরিব বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কাজ। সুস্থ্য সমালোচনা করা তোমার অধিকার, শেখায় জেএনইউ। তুমি চাইলে শিক্ষকের সমালোচনা করতে পার, তাকে প্রশ্ন করতে পার। অমুকে বলেছে বলেই তোমাকে তা মেনে নিতে হবে না। নিজের যুক্তির কষ্ঠিপাথরে বক্তব্যকে যাচাই করে তবেই তাকে মান, নয়তে তা প্রত্যাখ্যান কর। এই যুক্তিবাদের উপর নির্ভরশীল মানবতাবাদ জেএনইউ-র অন্যতম প্রধান শক্তি।

কিন্তু ভারতের বর্তমান সরকার যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে এক প্রভুত্ববাদকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সেই প্রভুত্ববাদে সরকারকে প্রভু হিসেবে মেনে নিলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু প্রশ্ন করলে, তাকে অস্বস্তিতে ফেললেই জুটবে চপেটাঘাত। নিজেদের এই প্রভুত্ববাদকে সরকার হিন্দুত্বের মোড়কে মুড়ে গোটা দেশে এক মাদকীয় পরিবেশ গড়ে তুলেছে। সেই মাদকতার নাম কখনো রাম মন্দির, কখনো গো-মাতা, কখনো জাতীয়তাবাদ। কিন্তু জেএনইউ-র ছাত্রদের বড়ো অংশ এই প্রকল্পের শরিক নয়। তারা প্রশ্ন করছে হিন্দুত্ববাদের ভিত্তি নিয়ে, তাদের প্রতিবাদ জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ সংজ্ঞার বিরুদ্ধে। তাই মসনদে বসার পর থেকেই জেএনইউ-কে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর মোদী সরকার।

একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতিকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পোরা হয়েছে, বহু ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে, বিভিন্ন বিভাগে আসন সংখ্যা কমানো হয়েছে, সংরক্ষণের নিয়মাবলীকে লঘু করা হয়েছে, যৌন উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া সংস্থাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এমনকি ছাত্র ইউনিয়নের বৈধতাকেও প্রশ্ন করা হয়েছে। তবু, এত কিছুর পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকেরা হার মানেননি, লড়াই ছাড়েননি। তাদের মতাদর্শ এবং বিশ্বাস থেকে তারা পিছু হটেননি, লাগাতার ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে গেছে, স্পর্ধার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করেছেন। যেখানে বিরোধী দলগুলি সরকারের প্রতাপের সামনে ম্রিয়মান, দিশাহারা, আপোশকামী, সেখানে শুধুমাত্র নিজেদের বিশ্বাস ও মননকে ভরসা করে লড়ে যাচ্ছে জেএনইউ। আগামীদিনের ইতিহাস গৌরবের সঙ্গে তাদের এই লড়াইকে স্মরণ করবে।

তিন বছর ধরে লাগাতার সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করে সেখানকার শিক্ষক ও ছাত্র আন্দোলনকে

স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েও তা সফল না হওয়ার কারণ খুঁজতে বেরোয় সরকার ও তার ভৃত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তারা অনুধাবন করে যে তাদের রণকৌশলে কিছু ভুল রয়ে গেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জীবনীশক্তি এবং প্রতিবাদী চেতনার শক্তিস্থল চিনতে পারেননি। আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শক্তি এখানকার ছাত্রদের বৈচিত্র্য। বিশেষ করে প্রান্তিক অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শক্তির উৎস। অতএব, এই উৎসকেই ধ্বংস করতে হবে। কম টাকায় গরিব ছাত্রদের পড়াশোনা করার সুযোগ দিয়ে আগের সরকারগুলি মস্ত ভুল করেছে। গরিব মানুষকে অত পড়াশোনা শেখালেই নানা প্রশ্ন করে তারা জেরবার করবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বাড়াও যাতে গরিবেরা আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পায়।

আগে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক ৩২০০০ টাকা অর্থাৎ মাসে ২৫০০ টাকার একটু বেশি খরচ করলে, থাকা খাওয়া ও ফি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা যেত, এখন বর্ধিত ফি শুরু হলে খরচ পড়বে ৬০০০০ টাকা। জেএনইউ-তে ৪০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এমন পরিবার থেকে আসে যাদের মাসিক আয় ১২০০০ টাকার কম। এর মধ্যে ৬০০০ টাকা দিয়ে সন্তানদের পড়াশোনা করানো অধিকাংশ পরিবারের পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে দুটি রাস্তা— পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া অথবা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হওয়া। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা দ্বিতীয় রাস্তাটি বেছে নিয়েছে।

সমস্যা শুধু ফি-বৃদ্ধি নয়। সরকারের ভৃত্য উপাচার্য ছাত্রদের অভিভাবক নন, পুলিশ হয়েছেন। জেএনইউ তার রাত্রিকালীন জীবনের জন্য বিখ্যাত। ডিনারের পরে আলোচনা সভা, মিটিং, মিছিল, আড্ডা, পাঠাগার, ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার ল্যাবে রাত জেগে পড়াশোনা সেখানকার জীবনের অঙ্গ। এখন উপাচার্যের নতুন নির্দেশিকায় রাত ১১টার মধ্যে সবাইকে হোস্টেলের ঘরে ঢুকে যেতে হবে, নয়তো জরিমানা। এই একুশে আইন প্রাপ্ত বয়স্ক গবেষণারত ছাত্রদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। বিশ্ববিদ্যালয়কে কারাগারে পরিণত করে আর যাই হোক পড়াশোনা হয় না।

তবু, বিজ্ঞ লোকের অভাব নেই। মিডিয়া প্রচার করে চলেছে কেন সস্তায় পড়াশোনার দাবি ছাত্ররা করছে? কেন সরকার ভরতুকি দেবে? এদের অশিক্ষা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল আমাদের হতবাক করে। অর্থনীতির যেকোনো পুস্তক খুলে দেখে নিন, তাতে বলা আছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উপর বিনিয়োগের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন হয়। এই ক্ষেত্রে বাজার প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারে না, করলেও সমাজের বৈষম্যের ফলেই এক শ্রেণির ছাত্ররাই পড়ার সুযোগ পাবে, গরিবেরা বঞ্চিত থেকে যাবে। তাই সমাজে বৈষম্য কমানোর জন্য উচ্চশিক্ষা গরিব মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের মতো দেশে তা করা সম্ভব সরকারি বিনামূল্যের শিক্ষার মাধ্যমে। ভারতের সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে জিডিপি-র অনুপাতে ১ শতাংশ টাকাও খরচ করে না। বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে এই নিরিখে ভারত নিচের সারিতে। যতটুকু উচ্চমানের শিক্ষা সরকারি ব্যবস্থায় আছে তাকেও ধীরে ধীরে গরিবের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে শুধু গরিবদের ক্ষতি তা নয়। দেশের শিক্ষার ক্ষতি, দেশের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, উন্নয়ন, সমতা সবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই জেএনইউ-র ছাত্রদের লড়াই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচানোর লড়াই, গরিবকে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়ার লড়াই, দেশের মানবসম্পদ বাঁচানোর লড়াই। এই লড়াই শুধু জেএনইউ-র লড়াই নয়, ভারতের ভবিষ্যতের লড়াই।

কেমন ভবিষ্যৎ দেখতে চান তা আপনাকেই চয়ন করতে হবে। একদিকে জেএনইউ-র বৃহত্তর স্বার্থের লড়াই, আরেকদিকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক লড়ছে দেশকে আরো গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন করার লড়াই। সেখানে একজন মুসলমান ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে সংস্কৃত বিভাগে পড়াবার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু মুসলমানের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ব না বলে কিছু হিন্দু উচ্চ বর্ণের ছাত্র ও শিক্ষক আন্দোলন করেছে, মুসলমান অধ্যাপকের ক্লাস বয়কট করেছে। ধর্মের ভিত্তিতে পড়াশোনার দাবি জানাচ্ছে কাশীর এই ছাত্ররা। জেএনইউ এক সমতার ভারতবর্ষের কথা বলে যেখানে চেন্নাইয়ের সেই গরিব ছেলেটি ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়, কাশীর হিন্দুত্ববাদী ছাত্ররা সমাজের বৈষম্যকে আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোথিত করতে চায়। আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি সমতার লড়াইয়ের শরিক হবেন নাকি সাম্প্রদায়িক দাবিকে মান্যতা দেবেন।

সমসাময়িক

দেশের নিলাম চলছে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতিটি বৈঠক এখন কোনো না কোনোভাবে দেশবাসীর কাছে উদ্বেগের কারণ। প্রতিটি বৈঠকেই এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যা অবাধে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটের বন্দোবস্ত করার জন্য উপযোগী। গত ৩০ মে নতুন করে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করার পর থেকেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে। এই ধারবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন হল ২০ নভেম্বর।

সেদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়— ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল), কনটেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (কনকর), শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, নিপকো (নর্থ ইস্ট পাওয়ার কোম্পানি) ও টিহরি জল বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (টিএইচডিসিএল)— এই পাঁচটি সংস্থার সরকারি শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া হবে। রীতিমতো ছক কেটে অঙ্ক কষে সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কোন সংস্থার বি-রাষ্ট্রীয়করণ কীভাবে করা হবে।

ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড বা বিপিসিএল-এ সরকারের শেয়ার ৫৩.২৯ শতাংশ। পুরো শেয়ার বেচে দেওয়া হবে, ছেড়ে দেওয়া হবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। তবে বিপিসিএল-এর মালিকানাধীন অসমের নুমালিগড় রিফাইনারি সরকার বা অন্য কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কিনে নেবে। শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এসসিআই-এ সরকারের শেয়ার ৬৩.৭৫ শতাংশ। পুরো শেয়ার বেচে দেওয়া হবে, ছেড়ে দেওয়া হবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। কন্টেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা কনকর-এ ভারত সরকারের শেয়ার ৫৪.৮ শতাংশ। এর মধ্যে ৩০.৮ শতাংশ শেয়ার বেচে দেওয়া হবে। ছেড়ে দেওয়া হবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। টিএইচডিসিআইএল অর্থাৎ টিহরি হাইড্রো ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে সরকারের ৭৪.২৩ শতাংশ শেয়ার ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনটিপিসি-র হাতে তুলে দেওয়া হবে। নিপকো-র ১০০ শতাংশ শেয়ারের মালিক ভারত সরকার। সব শেয়ার ও নিয়ন্ত্রণ এনটিপিসি-র হাতে তুলে দেওয়া হবে।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বা এনএইচএআই-এর ৭৫টি সড়ক প্রকল্প 'টোল অপারেট ট্রান্সফার'-এর ভিত্তিতে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হবে। এতদিন শর্ত ছিল, অন্তত দু'বছর টোল আদায় সরকারি হাতে রাখতে হবে। তা কমে এক বছর হচ্ছে। প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ বা পিপিপি পদ্ধতিতে জাতীয় সড়কগুলি গড়ে তোলার সময় বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়েছিল তা অমান্য করে ভারত সরকার নিজেই প্রকল্পভিত্তিক চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার ব্যবস্থা করে ফেলল। এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে আগামীদিনে বেসরকারি সংস্থাও চুক্তি ভাঙতে উৎসাহিত হতে পারে। তখন সরকারের কাছে বলার মতো কোনো যুক্তি থাকবে না।

সাধারণত 'টোল অপারেট ট্রান্সফার' প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যে চুক্তি করা হয় তাতে বারো থেকে তিরিশ বছরের মেয়াদের জন্য রাস্তা নির্মাণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি বহুবিধ শর্তসাপেক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়। পরিবর্তে বেসরকারি সংস্থা প্রথম দু-বছরের শেষে সড়ক থেকে আদায় করা যাবতীয় টোল করায়ত্ত করতে পারে। এখন সরকার শর্ত বদলে দেওয়ার অর্থ একতরফাভাবে চুক্তিভঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। আইনের চোখে ভয়ঙ্কর বেআইনি কাজ। বেসরকারি সংস্থা কিন্তু আদালতের দ্বারস্থ হবে না। কারণ তার স্বার্থেই এই শর্ত থেকে সরকার সরে যাচ্ছে। আবার ভবিষ্যতে বেসরকারি সংস্থা যদি একতরফাভাবে প্রকল্প পরিচালনার মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দেয় সরকারের পক্ষে তাতে আপত্তি করা মুশকিল হবে। তখন এই চুক্তি ভাঙার বিষয়টি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের এই নিদানপত্র হাতে নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন বি-রাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া সক্রিয়। উলটো পথে চলতে গেলেই বিপদ। বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি ইভো মোরালেস রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার হত্যা নতুন

কোনো বিষয় নয়। দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। বলিভিয়ার ঘটনা সেই তালিকায় নবতম সংযোজন। আর ভারতের শাসক তো প্রকাশ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সোচ্চার হয়ে সমর্থন করতে দ্বিধা বোধ করেন না। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের হয়ে প্রাক-নির্বাচনী প্রচারে জড়িয়ে পড়েন।

বলা হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সম্পদের অদক্ষ ব্যবহারও যুক্তিযুক্ত নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বি-রাষ্ট্রীয়করণ শুরু হয়েছিল। অথচ একবারের জন্যেও বলা হয় না কোন পরিপ্রেক্ষিতে বা কোন প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজের অবসানের পর ইস্পাত, বিদ্যুৎ, তেল শোধনাগার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গড়ে তুলতে বেসরকারি পুঁজি কেন উদ্যোগ নেয়নি? সেই প্রশ্নের জবাবে সরকার নিরুত্তর। সরকারের পরামর্শদাতাদের একাংশের প্রশ্ন, শ্লথ অর্থনীতির জেরে যখন বেসরকারি সংস্থাগুলি নতুন লগ্নি থেকে হাত গুটিয়ে রেখেছে, তখন সম্পত্তি বিক্রির জন্য বাজারে আনলে কি ভালো দাম মেলার নিশ্চয়তা থাকে? নাকি সেগুলি দ্রুত বেচে কোনোমতে রাজকোষ ব্যবস্থা সচল রাখাই কেন্দ্রের কাছে পাখির চোখ? অর্থের অভাবে সঙ্কটে পড়া পরিস্থিতি থেকে যে করে হোক, বেরিয়ে আসার জন্য সরকার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বছরখানেকের বেশি সময় ধরে অর্থব্যবস্থা ঝিমিয়ে রয়েছে। চাহিদা তলানিতে। ছ'বছরে সবচেয়ে কম বৃদ্ধি। শিল্পোৎপাদন ব্যাহত। নতুন নিয়োগ হচ্ছে না। বরং হচ্ছে ছাঁটাই। এই অবস্থায় চাহিদা বাড়াতে ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে লগ্নিতে উৎসাহ দিতে কর্পোরেট কর কমানো-সহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু এখনও বেসরকারি লগ্নিকারীরা সেভাবে হাত খোলেনি। কবে খুলবে অথবা আদৌ খুলবে কিনা বলা মুশকিল। ফলে চাহিদা বাড়াতে ভরসা সরকারি ব্যয়। কিন্তু কোষাগারের অবস্থা সুবিধার নয়। ব্যয় বাড়ালে ঝুঁকি রয়েছে রাজকোষ ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রা ছাড়ানোর। তার উপরে জিএসটি আদায় কমছে। আর্থিক সঙ্কট মেটাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতো ভিন্ন সূত্র থেকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিক্রি হয়ে যাওয়া নিয়ে সরকারের পরামর্শদাতাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। বি-রাষ্ট্রীয়করণের সময় নিয়ে তাদের যত চিন্তা।

ভবিষ্যতে আরও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের অর্থাৎ বি-রাষ্ট্রীয়করণের পথ প্রশস্ত করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আর্থিক বিষয়ক কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারের অংশীদারি ৫১ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা হবে। নীতি আয়োগ আগেই বিলগ্নিকরণের জন্য ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বাছাই করেছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণ সরকারি হাতে রাখা হবে কি না, তা আলাদাভাবে ঠিক হবে।

এই হয়েছে এক নীতি আয়োগ! এর সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। পেশাদার পরিকল্পনা বিশারদ নেই বললেই চলে। প্রশাসনিক পরিষেবার কয়েকজন প্রাক্তন ও প্রবীণ আধিকারিক নীতি আয়োগের যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে চলেছেন। যাঁরা মহকুমা-জেলা বা কোনো বিভাগের প্রশাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই সংস্থায় এসেছেন তাঁদের পক্ষে পরিকল্পনার মতো বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখানো সম্ভব? দ্বিতীয়ত প্রশাসনিক পরিষেবার আধিকারিকরা সাধারণত শাসকের নীতিকে বাস্তবায়নের কাজটিই দায়িত্ব নিয়ে পালন করতে অভ্যস্ত। তাঁদের মনে মৌলিক চিন্তা বা বিকল্পধারার মানসিকতা বিকশিত হওয়ার সুযোগ কোথায়? তাঁদের সঙ্গে কর্মরত রয়েছেন 'শতাধিক ইয়াং প্রফেশনাল'। সদ্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা পেরিয়ে আসা এইসব তরুণ-তরুণীরা উচ্চশিক্ষিত হলেও তাঁদের মধ্যে পরিকল্পনা সংক্রান্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব। সর্বোপরি তাঁরা ঠিকা চুক্তিতে নিযুক্ত। তাঁদের কোনো দায়বদ্ধতা থাকতে পারে? ফলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করা ছাড়া নীতি আয়োগের পক্ষে অন্য কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। এবং সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ হয় যে নীতি আয়োগের সুপারিশ অনুসারে এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিলগ্নিকরণ বা বি-রাষ্ট্রীয়করণ থেকে ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা তোলার লক্ষ্য নিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু অর্থ বছরের ছ-মাস কেটে গেলেও মাত্র ১৭ হাজার কোটি টাকা এসেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের পরে সেই লক্ষ্য ছাপিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বেলাশেষে যে প্রশ্ন সামনে এসে হাজির হয় তা হল— আজ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেচে কোষাগারে টাকা আসতে পারে। আগামিকাল কী হবে? বিশেষত বিপিসিএলের মতো লাভজনক সংস্থা বেচে দেওয়া, সংসার চালাতে সোনা বেচে দেওয়ার সামিল। বিগত অর্থবর্ষে অর্থাৎ ২০১৮-১৯-এ বিপিসিএল প্রায় ৭৮০০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। অনুমান করা হচ্ছে যে বিপিসিএল বেচে সরকারের ঘরে অন্তত ৬০ হাজার কোটি টাকা আসতে পারে। অর্থমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছেন, ২০২০-র মার্চের মধ্যেই এয়ার ইন্ডিয়া এবং বিপিসিএল বেচে দেওয়া হবে। তবে সমস্ত সরকারি প্রক্রিয়া মেনে এত কম সময়ে তা সম্ভব হবে কি না, সেই প্রশ্ন থাকছে।

অর্থ মন্ত্রকের বিলগ্নিকরণ দফতরের বক্তব্য, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, শেল, সৌদি অ্যারামকো, কুয়েত পেট্রোলিয়াম, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, এক্সন-এর মতো বিদেশি তেল সংস্থা বিপিসিএল কিনতে আগ্রহী হতে পারে। নরেন্দ্র মোদী আমেরিকার হিউস্টনে 'হাউডি মোদী' করে ফিরেছেন। বিপিসিএল বিক্রির জন্য হিউস্টনেই 'রোড শো' হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ক্রেতা না-মিললে 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' আর এক রাষ্ট্রায়ত্ত তেল

সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল-কে বিপিসিএলের শেয়ার বেচে দেওয়া হবে, যেভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এলআইসি-কে দিয়ে আইডিবিআই কেনানো হয়েছিল। শিপিং কর্পোরেশন ও কনকরের ক্ষেত্রে বিদেশের ডিবি ওয়ার্ল্ড বা দেশের আদানি গোষ্ঠী আগ্রহী হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রেল-তেল-টেল থেকে শুরু করে দেশের যাবতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সম্পদ বিক্রির এই প্রক্রিয়ার সরকারি নাম বিলগ্নিকরণ। রেলমন্ত্রীর মতে ভারতীয় রেলে বিলগ্নিকরণ নয় বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। মন্ত্রী-সান্ত্রীরা যে নামেই ডাকুন না কেন বাস্তবে পুরো বিষয়টি বি-রাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মোদীর বলসোনারো প্রীতি

২৬ জানুয়ারি ২০২০, প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানের প্রধান রাষ্ট্রীয় অতিথি হতে চলেছেন ব্রাজিলের দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারো। নরেন্দ্র মোদী তাঁর ব্রাজিল ভ্রমণের সময়ে বলসোনারোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তা সানন্দে গৃহীত হয়েছে। প্রত্যেক বছর ভারত কোনো না কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের প্রধান অতিথি রূপে। সেই রীতি মেনেই ভারতে এসেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা, বারাক ওবামা অথবা ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জন মেজর। কিন্তু এবার বলসোনারোর মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিতর্কিত ও নিন্দিত এক রাষ্ট্রনায়ককে আমন্ত্রণ জানানো দেখিয়ে দিচ্ছে যে নরেন্দ্র মোদী কোনো রাখঢাক না করেই তাঁর নগ্ন দক্ষিণপন্থাকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় ফিরি করতে বদ্ধপরিকর।

বলসোনারোর উত্থান ডোনাল্ড ট্রাম্পের পথ ধরেই হয়েছে, এবং তার পেছনে কাজ করেছে গণতন্ত্রের অবক্ষয়। ট্রাম্পের মতোই বলসোনারো তাঁর উত্থানকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন পপুলিস্ট বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু আসলে তাঁর প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ব্রাজিলের প্রাচীন অভিজাত সমাজ এবং অলিগার্কদের পুঁজি। বাকি পৃথিবীর একটা বড়ো অংশ বলসোনারোর থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে, কারণ পরিবেশ, লিঙ্গসাম্য অথবা অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর অবস্থান উগ্র দক্ষিণপন্থী, অনেক সময়েই প্রায় মধ্যযুগীয়। আমাজন অরণ্যকে নির্বিচারে পুড়তে দিয়ে, সেই অরণ্য ধ্বংস করে সেখানে শিল্পায়নের প্রচেষ্টা করতে দিয়ে এবং পরিবেশ রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্য প্রত্যাখান করে বলসোনারো তাঁর অসংবেদী অমানবিক নীতিকে আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরেছিলেন। অগাস্ট মাসে আমাজন অরণ্যের ভয়ংকর দাবানলকে সামলাবার কোনোরকম চেষ্টাই যখন বলসোনারো করছিলেন না, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইম্যানুয়েল ম্যাকরঁ তাঁর সমালোচনা করে বলেছিলেন যে জি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে এই বিষয়ে আলোচনা করা হোক। তাঁর বিরুদ্ধে বলসোনারোর প্রথম মন্তব্য ছিল যে ঔপনিবেশিক মানসিকতা এই যুগে এসে আর গ্রহণযোগ্য নয়। আর দ্বিতীয় মন্তব্য? কোনোরকম রাখঢাক না করেই বলসোনারো ম্যাকরেঁর স্ত্রী তথা ফ্রান্সের ফার্স্ট লেডির শারীরিক গঠন সম্পর্কে কদর্য উক্তি করেছিলেন। শুধু তাই নয়। নরওয়ে এবং জার্মানি যখন আমাজনকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসেছিল, বলসোনারো তাদের সঙ্গেও প্রকাশ্য বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। আর এটাকে শুধুমাত্র এক রাষ্ট্রনায়কের উন্মাদনা হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। এর পেছনে রয়েছে চতুর অর্থনীতির অঙ্ক।

বলসোনারো ক্ষমতায় এসেই বলেছিলেন, ব্রাজিলের অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করবার এক এবং একমাত্র দাওয়াই, আমাজনের জঙ্গল কেটে উন্নয়ন করা। তাঁর অভিযোগ ছিল, পরিবেশবিদদের নানা আপত্তিতে আমাজনের জঙ্গলকে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বস্তুত, এবারের দাবানল কতটা ভয়ানক সে ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনো তথ্যই ছিল না। কারণ প্রেসিডেন্ট সমস্ত সরকারি কর্মীদের মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। এটাও দেখানোর চেষ্টা চলেছিল যে এইসব নেহাতই গালগল্প। এর মধ্যেই বলসোনারো নতুন তত্ত্ব দিলেন যে এই আগুন নাকি পরিবেশবিদরাই তাঁকে অপদস্থ করবার উদ্দেশ্যে লাগিয়ে দিয়েছেন! চরম অসংবেদনশীল এই রাষ্ট্রনায়ক সাংবাদিকদের সামনে রসিকতাও করেছিলেন যে তিনি এবার সম্রাট নিরোর আসনে বসবেন! আর এগুলোর পেছনে একমাত্র কারণ ছিল পুঁজির নগ্ন লোভ।

১৯৬৫ সালের ব্রাজিলের অরণ্য বিধির আওতায় কৃষকরা আমাজনের জমি কিনতে পারেন কিন্তু চাষ করতে পারেন তার ২০ শতাংশ এলাকায়। ১৯৮৮ সালে সামরিক একনায়কতন্ত্র ধসে পড়ার পর নতুন সংবিধানে জমির আইনি মালিকানা দেওয়া হয়েছিল এলাকার আদিম বাসিন্দাদের। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন বলসোনারো। নির্বাচনী প্রচারে তিনি বলেছিলেন, তাঁর সরকার আমাজন এলাকা ব্যবসার জন্য খুলে দেবে। আমাজনে বিশাল পরিমাণ সোনা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ রয়েছে। কৃষিব্যবসা বাড়ানোর জন্য নীতিমালা গ্রহণ ছাড়াও বলসোনারো আদিম জনজাতিদের জমির সুরক্ষা দেওয়ার বিরোধিতা করেন। জয়ের কয়েক মাস আগে, ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, বলসোনারো আমাজন অববাহিকায় অবস্থিত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জয়ের পর তিনি বলেছিলেন,

'কয়েকজন ইন্ডিয়ান সংরক্ষণ করতে চায় বলে ব্রাজিল নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বসে থাকবে না।' এর মধ্যেই খুন হয়েছেন বেশ কয়েকজন পরিবেশবিদ, আমাজন বাঁচাবার জন্য যারা লড়ে যাচ্ছিলেন। তদন্ত যথারীতি বিশ বাঁও জলে।

কিন্তু শুধু পরিবেশই নয়। ব্রাজিলের ফুটবলার নেইমার যখন যৌন-হেনস্থায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তদন্ত শুরুর আগেই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলসোনারো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এসব অভিযোগ ভুয়ো, এবং তিনি নেইমারকে বিশ্বাস করেন। ২০১৪ সালে ব্রাজিলের সাংসদ মারিয়া ডি রোজারিওকে বলসোনারো বলেছিলেন যে তিনি তাঁকে ধর্ষণ করবেন না কারণ মারিয়া তার যোগ্য নন। এই কথাটা বলসোনারো নিজেই আবার ফলাও করে টুইটে জানিয়েছিলেন। এরকম মন্তব্যও তিনি করেছিলেন যে পরপর চার পুত্রসন্তানের জন্ম দেবার পর মুহূর্তের দুর্বলতায় তিনি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে ফেলেছেন। মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটিকে ব্যঙ্গ করে বলসোনারো একবার বলেছিলেন যে এত বেশি শ্রমিকের অধিকার আছে বলেই তিনি অধস্তন হিসেবে মহিলাদের রাখতে চান না।

এবং সমকামীদের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতাও সর্বজনবিদিত। একবার বলেছিলেন যে তাঁর ছেলে সমকামী হবার চেয়ে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলে তিনি খুশি হবেন। নিজেকে গর্বিত সমকামবিদ্বেষী হিসেবে ঘোষণা করেছেন ২০১৩ সালে। বলসোনারো নির্বাচিত হবার পর থেকেই সাও পাওলো বা রিও ডি জেনেইরোর মতো শহরে হু হু করে বেড়ে চলেছে সমকামীদের বিরুদ্ধে হিংসামূলক আক্রমণের ঘটনা। আবার ১৯৯৯ সালের এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে গণতন্ত্র নয়, ব্রাজিলের একমাত্র দাওয়াই হল হিংস্র গৃহযুদ্ধ। সেই গৃহযুদ্ধে নিরপরাধ মানুষ মরলেও তাঁর কিছু যায় আসে না, কারণ সব যুদ্ধেই নিরপরাধেরা মরে। তিনি স্পষ্ট করেই সেই সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে সংসদ নয়, তাঁর আদর্শ হল একনায়কতন্ত্র। এহেন ব্যক্তিকে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ডেকে আনছেন মোদী। আমাদের দেশে সংবিধান জন্মলগ্ন থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে। একনায়কতন্ত্র যখন পৃথিবীর অধিকাংশ তৃতীয় বিশ্বের দেশকে গ্রাস করেছে, অসাধারণ ব্যতিক্রম হয়ে রয়ে গেছে ভারত। সেই ভারতের সংবিধান দিবসে দেশে আসছে এক দুর্বিনীত একনায়কতন্ত্রের পূজারী।

আসলে, নরেন্দ্র মোদী নিজেও রাজনৈতিক চরিত্রে বলসোনারোর কাছাকাছি। তাঁর বিজেপি দলটিও মধ্যযুগীয় অশিক্ষা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ একটা অন্ধকারের শক্তি হিসেবেই উঠে এসেছে। লিঙ্গসাম্য বিষয়ে, নারীদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বিজেপির মনোভাব একটু সোসাল মিডিয়াগুলোতে চোখ রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। জেএনইউ অথবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিজেপি-র অসহিষ্ণু মনোভাব, কারণ সেখানে মেধার চাষ হয়, প্রশ্ন তোলার অধিকার শেখানো হয়, সেই মনোভাব পুরোপুরি বলসোনারোর সুযোগ্য মিত্র হিসেবেই বিজেপি-কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ভারতবর্ষেও বাস্তার ছত্তিশগড় ও দণ্ডকারণ্যতে আদিবাসীদের উৎখাত করে সালোয়া জুডুম, জনসুরক্ষা ইত্যাদি আইনের সাহায্য নিয়ে বেদান্ত বা টাটা স্টিল জাতীয় বহুজাতিকেরা যখন অরণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তাকে একইভাবে বৈধতা দিচ্ছে বিজেপি সরকার। সেই হিসেবে বিজেপি যোগ্য ব্যক্তিকেই প্রধান অতিথি করছে বলা যায়। তবে এই প্রহসনের পালা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে যেদিন মোদী সরকার খোমেইনি, তালিবান অথবা সৌদির কোনো ধর্মগুরুকে প্রধান অতিথি বানিয়ে নিয়ে আসবে। কারণ বলসোনারোর যুক্তিতেই, খোমেইনির মতো ধর্মগুরুরা, অথবা তালিবানি শাসকেরা একইরকম কট্টর সামাজিক দক্ষিণপন্থী, এবং পরিবেশ বা লিঙ্গসাম্য বিষয়ে তাদের অবস্থান বিজেপি-র সঙ্গে সমানে সমানে যায়। সবরকম মৌলবাদীরা আগামীর কোনো এক প্রজাতন্ত্র দিবসে এসে এক বিন্দুতে এসে মিলে যাক, গণতন্ত্র তবেই তো সার্থক!

সুপ্রিম ও সুপ্রিমো

ভারতে সুপ্রিম কোর্ট শব্দটার জন্ম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়মে স্থাপিত হয় সুপ্রিম কোর্ট অফ জুডিকেচার। প্রথমেই দ্বন্দ্ব বাধে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে। কার কর্তৃত্ব কতটা ও কতদূর। সুপ্রিম কোর্টের মত ছিল, বাংলা বিহার ওড়িশার যেকোনো অধিবাসীর বিচার তাঁরা করতে পারবেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের কর্তৃত্বাধীন সুপ্রিম কাউন্সিল চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। অবশেষে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সংসদ রায় দিল, কলকাতা, বাংলা বিহার ওড়িশার যেকোনো ব্রিটিশ অধিবাসীর বিচার করতে পারবে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু যেকোনো বাসিন্দার নয়।

সুপ্রিম কোর্ট ও তার রায় নিয়ে বিতর্ক আছে শুরু থেকে। ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে নন্দকুমারের। সিরাজউদ্দৌলাকে প্রতারণা করে ইংরেজ সহচর হয়েছিলেন নন্দকুমার, হয়ে ওঠেন ক্লাইভের বন্ধু। এর পর কিন্তু হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয় না। তখন কোম্পানির শাসন চলত

সুপ্রিম কাউন্সিলের নামে। কাউন্সিলের চার সদস্য। তিন সদস্য হেস্টিংসের বিরুদ্ধে। নন্দকুমার ফ্রান্সিস-সহ তিনজনকে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ঘুষ ও দুর্নীতির নানা তথ্য সরবরাহ করতে থাকেন।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা আনেন। সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ বছর আগের ঘটনা। প্রশ্ন উঠল, যখন সুপ্রিম কোর্ট ছিল না, তখনকার ঘটনার বিচার সুপ্রিম কোর্ট করতে পারে কি না? সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের স্কুলের সহপাঠী।

তিনি রায় দিলেন, পারেন। এবং শেষ পর্যন্ত সাজানো বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হল। ভারতীয় আইনে কোনো ভারতীয়ের ফাঁসি হতে পারে না। এই যুক্তিতে এর আগে এক ব্যক্তিকে ফাঁসির আদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু নন্দকুমারের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হল। নন্দকুমার ফাঁসিতে ঝুললেন।

এ নিয়ে ব্রিটিশ সংসদে ঝড় উঠল। হেস্টিংস ও ইম্পের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পেলেন। কিন্তু হেস্টিংসের জীবনীকারকে লিখতে হল, হেস্টিংস ও প্রধান বিচারপতি ইম্পে জালিয়াত ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত।

আঠারো শতকে সংবাদপত্র যে সাহস দেখিয়েছিল আজকের ভারতে তা অবশ্য স্মরণযোগ্য। জেমস অগাস্টাস হিকি (১৭৪০-১৮০২) ছিলেন একজন আইরিশ। তিনি ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল গেজেট' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে বাক স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের দুর্নীতি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারেবারে লেখেন। তাঁর কাগজ বন্ধ করা হয়। তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। নির্বাসিত করা হয়। তবু দমেননি। ওয়ারেন হেস্টিংসকে 'নপুংসক' পর্যন্ত লেখেন। আজকে 'যুদ্ধোন্মাদ' সময়ে তাঁকে অবিশ্বাস্য মনে হবে, তিনি সাম্রাজ্যবিস্তার, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কলম লেখেন। গরিবের পক্ষে দাঁড়ান। প্রতিনিধিত্বমূলক করের পক্ষে প্রচার চালান। তৎকালীন শাসকরা তার বিপক্ষে একটি কাগজ প্রকাশে মদত দেন। ইন্ডিয়া গেজেট। কোনো বিজ্ঞাপন পাননি হিকিসাহেব। বিপরীতে ইন্ডিয়া গেজেটের আর্থিক রমরমা।

সবচেয়ে বড়ো কথা সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পোকেও তিনি রেয়াত করেননি। তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযুক্ত করেন।

হেস্টিংস হিকির পত্রিকা ডাকে পাঠানো বন্ধ করেন। তবু তাঁকে দমানো যায়নি। বিচারপতি এলিজা ইম্পের কাছে সম্পাদক হিকির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে চারটি সাজানো শুনানির পর তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলে পাঠানো হয়। জেলে গিয়েও দমেন না। সেখান থেকেই তাঁর পরিচালনায় প্রকাশিত হতে থাকে সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট'। অবশ্য সুপ্রিট কোর্টের রায়ে তাঁর প্রেসের সমস্ত টাইপ বাজেয়াপ্ত করে সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করা হয় ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ৩০ মার্চ। হিকি রাষ্ট্র, বিচার বিভাগ এবং ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তাঁর সংবাদপত্রে। আজ হিকিরা কোথায়? হিকির অনুগামী প্রায় বিরল। রবীশ কুমার, প্রসূন বাজপেয়ীরা চেষ্টা করছেন। আনন্দবাজার, দি টেলিগ্রাফ, হিন্দু পত্রিকা এখনও মাথা নোয়ায়নি। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো বিজ্ঞাপন পায় না— এই তিন সংবাদপত্র। দি টেলিগ্রাফ তো অসাধারণ সব শিরোনাম করছে। কুর্নিশ সম্পাদককে।

কিন্তু বাকি সব করে রব।

ইংরেজরা পরবর্তীকালে কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজের সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যে রাজ্যে হাইকোর্টও তৈরি হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়ান হাইকোর্টস আইন মোতাবেক। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় নতুন সংবিধান অনুযায়ী। ২৮ জানুয়ারি কাজ শুরু হয়।

ভারতে সুপ্রিম কোর্ট এক অভূতপূর্ব বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে। লোকে কোনো প্রতিকার না পেলে বলতো, কোর্টে দেখা হবে। সুপ্রিম কোর্টে দরকারে যাব। সুপ্রিম কোর্ট শাসনবিভাগের সঙ্গে স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে। অনেককেই রেয়াত করেনি। সিবিআইকে বলেছিল খাঁচায় বন্দি তোতাপাখি। পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্য ছিল, সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী।

শবরীমালা প্রশ্নে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। তিন তালাক নিয়েও। কিন্তু বাবরি মসজিদ-সহ কয়েকটি ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে অনেকের মনে হয়েছে। সিজারের পত্নীকে সব সময় সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়। কিন্তু তা কতটা হচ্ছে, সে নিয়ে নানা সংশয়। গত বছর সুপ্রিম কোর্টের চার বিচারপতি বিদ্রোহ করেন। যা অভূতপূর্ব ছিল। বিচারব্যবস্থায় শাসকের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল।

বিচারপতি চেলামেশ্বর এক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নাম জমি দুর্নীতিতে জড়িয়েছিল। সদ্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নামে সুপ্রিম কোর্টের এক তরুণী কর্মী শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন।

এরপর কিছু রায় ঘিরে প্রশ্ন উঠতে থাকে। কর্নাটক বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ঐতিহাসিক রায় দেন সুপ্রিম কোর্ট।

দেশের প্রকাশ্য এবং গোপন ফ্যাসিবাদী সুপ্রিমোর কবলে নির্বাচন কমিশন, সিবিআই, ইডি আয়কর-সহ বহু প্রতিষ্ঠান।

সুপ্রিম কোর্ট যেন সুপ্রিমোর আদেশে না চলে এই প্রার্থনা।

বিদ্যাসাগরের আয়নায় বাঙালি

অনুরাধা রায়

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা বেশ হইচই ফেলে দিয়েছিল— আমাদের সবারই সেটা মনে থাকার কথা। বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত ও পরে তাঁর নামাঙ্কিত কলেজে[১] বেদীর ওপর বসানো ছিল তাঁর মূর্তি; তো কারা যেন সেখানে ঢুকে পড়ে ভাঙচুর চালায়, মূর্তিটিও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এটা কাদের কীর্তি— ক-দলের, না খ-দলের— তা নিয়ে খুব খানিক তর্কাতর্কি হল। দু-দলই বিদ্যাসাগরের প্রতি যথোচিত ভক্তিজ্ঞাপন করল। খ-দল আবার বিদ্যাসাগরকে বাঙালিত্বের সঙ্গে সমীকৃত করে বলল, এ হল বাঙালি সংস্কৃতির অপমান, এ বাঙালি কখনোই মেনে নেবে না। এইভাবে তারা নির্বাচনের আগে অধি-বঙ্গীয় রাজনীতিকে প্রতিহত করার একটা অস্ত্র পেয়ে গেল। এখন আমার প্রশ্ন হল, ওই বেদীর ত্রিসীমানায় কোথাও কি বিদ্যাসাগর ছিলেন? উনি তো বেঁচে থাকতেই কর্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের মধ্যে গিয়ে বাস করতেই স্বস্তি বোধ করতেন— সাধারণভাবে যাকে বাঙালি সমাজ বলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করে। আমার তো মনে হয়, বাঙালি সমাজের পক্ষে তিনি নিতান্ত বেখাপ্পাই ছিলেন এবং আজও তাই আছেন।

এটা ঠিকই যে, বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য, কর্মক্ষমতা, দয়াদাক্ষিণ্য ও সর্বোপরি তাঁর অমিতবিক্রম তেজ-এর সম্ভ্রমপূর্ণ স্বীকৃতি বাঙালি দিয়েছে। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের নিজ প্রতিভায় ও উদ্যোগে সমাজের উচ্চতম শিখরে আরোহণও আধুনিকতা-সাক্ষরিত প্রগতির ইতিহাসের একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ কাহিনি হয়ে উঠেছে ('আধুনিকতা-সাক্ষরিত প্রগতি' কথাটাতে আধুনিকতার উন্মুক্ততার দাবি নিহিত— এই দাবি যে, আধুনিক সমাজে কারোর সমাজপ্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র জন্ম বা পারিবারিক পটভূমি দিয়ে নির্ধারিত হয় না)। তাছাড়া তো তাঁর বহুবিধ কীর্তি থেকে বাঙালি উপকৃত হয়েছে এবং ফলে তাঁকে মান্যতা দিয়েছে। এক, মেয়েদের দুর্দশামোচনে তাঁর সমাজসংস্কার, বিশেষত বিবাহপ্রথা সংস্কারের নানা প্রচেষ্টা (বিধবাবিবাহের সপক্ষে এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতায়); দুই, শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ, নারীশিক্ষার তো বটেই; এবং তিন, আধুনিক বাংলা গদ্য নির্মাণে তাঁর অবদান— এগুলিকে মেনে না নিয়ে বাঙালির উপায় নেই। এবং ফলে তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে তিনি যথাযাগ্যভাবেই সম্মানিত।[২] অবশ্য লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, নিন্দেমন্দও তাঁর কপালে কম জোটেনি— সমসময়েও বটে এবং পরবর্তীকালেও। সমসময়ে সেটার উৎস ছিল সামাজিক রক্ষণশীলতা; পরবর্তীকালে ব্যাপারটা উলটো— বেশ র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওই রেনেসাঁসের চরিত্র নিয়ে সংশয়, ফলে তার সীমাবদ্ধতা বিদ্যাসাগরের ওপরেও আরোপ করার প্রবণতা (যেটা বদরুদ্দীন উমরের মতো মার্কসবাদী লেখকদের কলমে খুব পাওয়া যায়)[৩]। আবার বাঙালির সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্যের অভাব এবং ফলত ট্র্যাজিক একাকিত্বের ওপরেও জোর পড়েছে কারো কারো লেখায়। অশোক সেনের Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones সুপরিচিত[৪]। বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলার একটি বিখ্যাত গল্পকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে সেন বলেছেন, তাঁর মাইলফলকগুলি সব অধরা থেকে যায়, কারণ খণ্ডিত বিকৃত ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকে তিনি তাঁর নিজের খাঁটি আধুনিকতা দিয়ে আয়ত্ত করতে চান। যদিও ব্রায়ান হ্যাচার বলছেন, বিদ্যাসাগরের পটভূমি থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখার কোনো মানে হয় না। সে পটভূমিতে সেকেলে পণ্ডিতি ঐতিহ্য যেমন ছিল, তেমনি সৃজ্যমান আধুনিক মধ্যশ্রেণির নির্মাণ-প্রক্রিয়াও ছিল।[৫] সুমিত সরকারও বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁর পটভূমির ওপর জোর দিয়েছেন; তবে পটভূমিটাকে শুধু তাঁর চিন্তাভাবনা ও চরিত্রের উৎসস্থল হিসেবে না দেখে তাঁর বাস্তবানুগ কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখতে চেয়েছেন (আশা করি, হ্যাচারের সঙ্গে সরকারের বক্তব্যের পার্থক্যটা আমাদের আলোচনায় পরে স্পষ্ট হবে)।[৬] অর্থাৎ সব মিলিয়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্র এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমি বেশ জটিল। তা অমি বলব, সে তো বটেই, একজন মানুষ, তিনি যতই বড়ো মানুষ হোন না কেন, ইতিহাসের মধ্যে থেকেই

তো তৈরি হয়ে ওঠেন। তবু আমি কিন্তু আজ বিদ্যাসাগরকে ইতিহাসলগ্ন করে না দেখে তাঁকে ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেখতে চাই। বিদ্যাসাগর যেপথে যেভাবে হাঁটতে চেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, বাঙালির আধুনিক বিকাশের ইতিহাস সম্পূর্ণ তার বিপরীত। বিদ্যাসাগর চরিত্র ট্র্যাজিক কিনা, নাকি অতটা কিছু ট্র্যাজিক নয়, কারণ তিনিও তো মধ্যশ্রেণির লোক, তাঁর মানসিকতা, উদ্যম ইত্যাদি তো এই শ্রেণির ইতিহাসের বাইরে নয়— সেসব তর্ক হতেই পারে; কিন্তু তার মধ্যে আমি খুব একটা যাব না। শুধু এটুকু বলব যে, তিনি বাঙালি সমাজে এক বেখাপ্পা ব্যক্তি— শুধু সমসময়ে নয়, আজও। মানুষ প্রাণীটি এমনিতেই খুব জটিল, বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ হয়তো বেশি করে জটিল। তাঁকে নিয়ে সুপ্রচুর গল্পগাথা তাঁকে বোঝার ব্যাপারটা আরোই কঠিন করে তুলেছে। তাঁকে যে যার মতো করে লোকে বুঝতে চেয়েছে, সে হয়তো অনেকটাই তাদের যে যার নিজস্ব তাগিদ ও কল্পনা অনুযায়ী। আমিও বোধহয় আমার মতো করেই তাঁকে কল্পনা করে নিয়েছি। কিন্তু আসলে আমি আজ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের নিয়েই, মানে বাঙালি সমাজ নিয়েই, আরো নির্দিষ্টভাবে বললে বাঙালি মধ্যশ্রেণিকে নিয়ে, বেশি করে প্রশ্ন তুলতে চাই। মানে বিদ্যাসাগর নামক যে আয়নাটা আমার হাতে এসে পৌঁছেছে, তার চুলচেরা বিশ্লেষণে না গিয়ে আমি ওই আয়নার সামনে বাঙালি সমাজকে ধরলে কেমন দেখায় তারই একটা ধারণা করতে চাই।

এটা তো ঠিক যে, বিদ্যাসাগর আকাশ থেকে পড়েননি। একটা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকেই উঠে এসেছিলেন। সেটা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি, উপনিবেশের আওতায় আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। এই প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রকর— নেতৃসমাজই বলা যায়— মধ্যশ্রেণি। বাংলায় বলে মধ্যবিত্ত বা ভদ্রলোক। তা বিদ্যাসাগর সেই ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণির গঠনপ্রক্রিয়া তথা সামাজিক নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা তাঁর মধ্যেও পাওয়া যায় বইকি! কিন্তু একেকজন মানুষ জন্মায়, যারা বোধহয় ইতিহাসের থেকে বড়ো হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর সেরকম একজন মানুষ— মানুষের মতো মানুষ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায় 'the first man among us'। শ্রেণি, গোষ্ঠী ইত্যাদির চেয়ে মানুষ পরিচয়টাই এরকম মানুষের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। ইতিহাসের মধ্যে এরা ঠিক আঁটে না। ইতিহাস বড়োজোর নিজের মাপে ছেঁটেকেটে নিয়ে এদের গ্রহণ করে। শুধু সমসাময়িক কাল নয়, পরবর্তীকালের প্রশংসা বা নিন্দা— মানে, বিদ্যাসাগরকে দেবতা বানিয়ে পুজো করা আর বুর্জোয়া বলে মুণ্ডপাত করা (কখনো একেবারে আক্ষরিক অর্থে!) —দুটোই ইতিহাসলগ্ন। কিন্তু আমি বিদ্যাসাগরের মধ্যে ঔপনিবেশিক যুগের মধ্যশ্রেণির ইতিহাসের থেকেও যা বেশি করে দেখি তা হল তাঁর পরম করুণা, চারিত্রগুণ হিসেবে বলতে পারি কারুণ্য বা মানবিকতা, এবং টনটনে কাণ্ডজ্ঞান; আর দুটোরই চরিতার্থতার লক্ষ্যে তাঁর অসাধারণ বলিষ্ঠতা। আমার এই দেখাটা বোধহয় অনেকটা রবীন্দ্রনাথের দেখার কাছাকাছি। 'বিদ্যাসাগরচরিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বারবার বিদ্যাসাগরের 'বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত' কারুণ্য (শুধু দয়া নয় 'দয়ার মধ্য হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া ওঠে') এবং তারই সমান্তরালে তাঁর 'সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি' (যে বুদ্ধিবৃত্তি শুধু বাঙালির মতো 'অতিসূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে' না) দেখেছিলেন।[৭] তা আমার মনে হয়, এই 'সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা' (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) অনেকটা ইতিহাসনিরপেক্ষ ব্যাপার; এবং বিদ্যাসাগরের ইতিহাসজাত শ্রেণিগত পরিচয়ের আগে ও পরে বাধ্যত এটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমার কাছে বড়ো কথা হল— এই দুটি ইতিহাস-নিরপেক্ষ চারিত্রগুণ দিয়ে তিনি ইতিহাসের দখল নিতে চেয়েছিলেন, যা সাধারণভাবে বাঙালি কোনোদিন নিতে পারেনি, নিতে চায়ওনি। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন, এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না।' আমি শুধু এটুকুই যোগ করব, আজও বিদ্যাসাগর একক এবং আজও তাঁর স্বজাতি-সোদর তেমন কেউ নেই।

বাংলার আধুনিকতার ইতিহাসের পুরোভাগেই রয়েছে এই মধ্যশ্রেণি তথা ভদ্রলোক। আর তাদের গড়ে ওঠার ইতিহাসে যেটা খুব বেশি করে ঐতিহাসিকদের নজর কেড়েছে তা হল— শ্রেণিস্বার্থের লালন ও সংরক্ষণে খুব বেশি ঝোঁক; তলার দিকের গরিব মানুষদের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান; কথায় আর কাজে, সংস্কৃতি আর যাপিত জীবনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ফলে বড়ো করে কোনো মানবিক মতাদর্শের কথা যতই তারা বলুক, শেষপর্যন্ত দুর্বলচিত্ততা, সংকল্পহীনতা ও ভণ্ডামি এই ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে প্রকট। এই শ্রেণির স্ববিরোধিতা নিয়ে ১৯৭০-এর দশকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন অশোক সেন, সুমিত সরকার প্রমুখ বিদ্বজ্জন।[৮] এঁরা তখন মধ্যশ্রেণির সীমাবদ্ধতার দায়টা চাপিয়েছিলেন অনেকটা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির ওপর, যার ইতিহাস ভারতের মধ্যে বাংলায় দীর্ঘতম ও প্রবলতম (ব্রিটিশ কিনা একেবারে গোড়াতেই বাংলার দখল নিয়েছিল)। এঁদের তৎকালীন বক্তব্য— যেহেতু সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে যাবার প্রক্রিয়াটা এখানে ঠিক ইউরোপের মতো হয়ে উঠতে পারেনি (এই প্রক্রিয়াটাকে normative model বলে ধরে নিয়েছিলেন),

তাই এখানে আধুনিক যুগের ধ্যানধারণাগুলির আমদানি হলেও তাদের সার্থক হবার পথটা, সার্থক করার জন্য মধ্যবিত্তের তরফে যে সামাজিক নেতৃত্ব দেওয়া দরকার— সেটা এখানে সম্ভবপর হয়নি। আরেকটু বুঝিয়ে বলি। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে উনিশ শতক থেকে এদেশের নব্য-মধ্যবিত্তের চিন্তায় এসেছিল যৌক্তিকতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রেরণা, দিগন্তে যেন দেখা গিয়েছিল এক নতুন ভাববিশ্ব। যে বিশ্ব ইউরোপে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে— রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট, শিল্পবিপ্লব হয়ে, পুঁজির বিকাশ ঘটতে ঘটতে, এবং তার সঙ্গে মধ্যবিত্তের সামাজিক নেতৃত্বের বিস্তার হতে হতে। কিন্তু আমাদের তথাকথিত উনিশ শতকীয় নবজাগরণ তো কোনো সর্বব্যাপী ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে উত্থিত হয়নি। তাই আমাদের এখানে ইউরোপীয় ভাববিশ্বের অভ্যর্থনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অনেক অসঙ্গতি। ফলে যুক্তি ও মানবতার গতিপথ এদেশে বহু দ্বন্দ্বে কণ্টকিত থাকল। অশোক সেন পরেও একটা লেখায় বলছেন— 'আমাদের ইতিহাসে তাই মুখ আর মুখোশের ছড়াছড়ি। তাই তো আজও আমরা উত্তর-ঔপনিবেশিক মোট বহর বইতে বইতে কুল পাই না।'[৯] পুরোপুরি উপনিবেশবাদ দিয়ে এই ব্যাখ্যাটাতে আমাদের অস্বস্তি হতে পারে, আর আধুনিকীকরণের একটাই নর্মাটিভ মডেল ধরে নেওয়াটাও হয়তো ঠিক নয় (বস্তুত, এইসব আলোচকও পরে এই ঝোঁকটা থেকে সরে আসেন)। কিন্তু বাংলার ঔপনিবেশিক মধ্যশ্রেণির চরিত্র এঁরা যেভাবে দেখেছেন, সেটা বোধহয় খুব একটা ভুল নয়। তা আমার মনে হয়, ঔপনিবেশিক মধ্যশ্রেণির চরিত্র এঁরা যেভাবে দেখেছেন, সেটা বোধহয় খুব একটা ভুল নয়। তা আমার মনে হয়, ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের চরিত্রের থেকে বেশ অন্যরকম বিদ্যাসাগরের চরিত্র, অন্তত যেভাবে তা আমাদের সামনে প্রতিভাব হয়েছে। ওই শ্রেণিরই মানুষ তিনি, তাঁরও কিছু স্ববিরোধিতা বা অসঙ্গতি যে ছিল না তা নয়। তবু তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসের অনন্য চরিত্র।

আর, আগেই যা বললাম, এই অনন্যতা তাঁর সহজাত কাণ্ডজ্ঞান আর কারুণ্যের দৌলতে। এই কাণ্ডজ্ঞান আর কারুণ্য শ্রেণিনিরপেক্ষভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার বন্ধন। কোনো কৃত্রিম প্রগতিশীলতা নয়, রাজনৈতিক সঠিকতা নয়, তাঁর জীবনকাহিনি জুড়ে একটা পরম মানবিক নরম মনের পরিচয়, যে মন সম্পর্কে মাইকেল বলেছিলেন 'বাঙালি মায়ের' মতো মন। আর তাঁর কাণ্ডজ্ঞানেও এই ঐকাত্ম্যের পরিচয়। পণ্ডিতিপনার ঝোঁক তাঁর মোটেও ছিল না, বিদ্যার কূটকচালি তাঁর পছন্দ নয়। ১৮শ শতকে স্কটল্যান্ডে হয়েছিল 'কমন সেন্স' ফিলসফির আন্দোলন— টমাস রীড, ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট তার প্রবক্তা। দর্শনকে তাঁরা মেলাতে চেয়েছিলেন লোকপ্রজ্ঞার সঙ্গে, মানবিক উপাদানের সঙ্গে দর্শনচর্চার সঙ্গতিসাধন করতে চেয়েছিলেন। এঁদের বইগুলি সব বিদ্যাসাগরের সংগ্রহে ছিল— দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিদ্যাসাগর সংগ্রহে আজও সেগুলি আছে।[১০] তবে কিনা 'কমন সেন্স' যেখানে অন্ধ দেশাচারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, বিদ্যাসাগর সেখানে তাকে মুক্তি দিয়ে বুঝেছেন, খণ্ডন করতে চেয়েছেন।

আসলে, সমাজের যেসব স্তর থেকে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত তৈরি হয়ে উঠছিল বিদ্যাসাগরের জন্ম তার মধ্যে খুবই নিচের একটা স্তরে। সেকেলে বামুন পণ্ডিতের পরিবার, দারিদ্র্যগ্রস্ত। দিন গুজরান অসম্ভব হয়ে উঠলে বাবা ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে দু-টাকা মাইনের সামান্য চাকরি নেন। বাবার কলকাতাবাসের সুবাদেই বিদ্যাসাগর কলকাতায় পড়তে আসতে পারেন। কিন্তু তখনকার দিনের দ্বিতীয় শ্রেণির (second grade) শিক্ষা সেটা। ইংরিজি নয়, সংস্কৃত শিক্ষা সংস্কৃত কলেজে, যে কলেজকে ফালতু জ্ঞানে একটা সময়ে প্রায় তুলে দেবার কথাই ভাবা হয়েছিল। অনেকটা হয়তো তাঁর এই পটভূমিকার দরুণই তাঁর শিকড় ছিল লোকজীবনের অনেক গভীরে। অবশ্য এটাও ঠিক যে অনুরূপ পটভূমি থেকে আরো অনেক পণ্ডিত সেযুগে কলকাতায় চলে আসছিলেন, কিন্তু সবাই বিদ্যাসাগর হননি। বিদ্যাসাগরের শিকড় আসলে কোনো বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শ নয়, আদিম স্বতঃস্ফূর্ত মানবতা দিয়ে তৈরি। তবু হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরও তো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকই ছিলেন, এবং আরো ভালো করে সেটাই হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। সেই সমাজের পরিসরেই তাঁর বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে যাওয়াটাও নজরে পড়তে বাধ্য। মধ্যবিত্ততা নয়, তাঁর জীবনের ভরকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। তাঁর চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের একেকটি দিক সংক্ষেপে ছুঁয়ে এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করব।

নারীসংক্রান্ত: ভদ্রলোকদের ভদ্রলোক হয়ে ওঠা, মানে ভদ্রলোকোচিত মর্যাদালাভের এজেন্ডায়, কেন্দ্রীয় স্থানে ছিল তাদের বাড়ির মেয়েরা। মেয়েদের বিয়ে, পড়াশোনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কারসাধন করে পুরোনো পিতৃতন্ত্রের পুনর্বিন্যাস আর তাদের আরো বেশি করে পিতৃতন্ত্রের আওতাতেই রেখে দেওয়া— এই ছিল সেসব সংস্কারের উদ্দেশ্য। ভাবা হয়েছিল— মেয়েরা আধুনিক মেমসাহেব আর সাবেকি সতীলক্ষ্মীর মাঝামাঝি কিছু একটা হবে। পড়াশোনা শিখবে, কিন্তু সে আরো বেশি করে সুমাতা, সুগৃহিণী হবার জন্য। এই ভাবনাটা ঘনীভূত হল জাতীয়তাবাদের জাগরণের ফলে। কারণ

জাতির inner domain বা অন্তর্জগতের— সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক জগতের— শুদ্ধতা তো মেয়েদেরই রক্ষা করতে হবে। এই সংস্কারের এজেন্ডা নিয়ে নিয়ে সেযুগে তর্কবিতর্ক অনেক হয়েছে। ঐতিহাসিকরা এমনও দেখিয়েছেন যে, রক্তমাংসের মেয়েরা এই প্রক্রিয়ায় নিতান্ত তুচ্ছ ছিল— সবটাই সাহেবদের সাপেক্ষে বা নিজেদের নানান গোষ্ঠীর মধ্যে প্রেস্টিজের লড়াই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মেয়েদের জন্য যা করেছেন— বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ রদ ইত্যাদির জন্য— তা নিতান্ত সহমর্মিতা থেকে, হৃদয়-নিঙড়োনো দরদ থেকে করেছেন (সে হয়তো খানিকটা ওই মাইকেল-কথিত 'বাঙালি মায়ের মতো মন' বলে)। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় মেয়েদের চরম যন্ত্রণা তিনি দেখেছিলেন, তা থেকে হয়তো male guilt-ও কাজ করত মনের মধ্যে। আর নারী বলতেই তো তাঁর মনে জেগে উঠত বিশেষ কিছু রক্তমাংসের নারীর মুখ। এক) মা ভগবতী, দুই) কলকাতায় যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন পড়াশোনার জন্য, সে বাড়ির এক বিধবা মহিলা রাইমণি, যাঁর স্নেহ তাঁর পরম পাথেয় ছিল, তিন) অনেক পরে বন্ধুকন্যা প্রভাবতী, যে মেয়েটি মাত্র তিন বছর বয়সে মারা যায় তাঁর বুক ভেঙে দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর লেখেন 'প্রভাবতী সম্ভাষণ', একান্ত ব্যক্তিগত বিলাপ, কোথাও ছাপাননি। তাঁর মৃত্যুর পর লেখাটি আবিষ্কৃত হয়।

শিক্ষাসংক্রান্ত: নারীশিক্ষার বিস্তারে তো বটেই, সাধারণভাবে শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের যে ভূমিকা তাকেও শ্রেণিনিরিখে ততটা নয়, বরং মানবতার নিরিখে বুঝতে ইচ্ছে করে। যতই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে universal public education বলা হোক, সবসময়ে তা এলিট শ্রেণির দ্বারা এলিট শ্রেণির স্বার্থেই চালিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে তো সাহেবি শাসনের ধারক-বাহক একটা শ্রেণি তৈরি করাই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে বিদেশি শাসকদের সঙ্গে দেশীয় এলিটদের দিব্যি ঐকমত্য ছিল। তাই জোর পড়েছিল এলিটদের জন্য উচ্চশিক্ষায়, ইংরেজি শিক্ষায়। বিদ্যাসাগর চাইলেন সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা, তাই জোর দিলেন প্রাথমিক শিক্ষায়, তাই জোর দিলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষায়। মাতৃভাষায় শিক্ষা মানে কিন্তু তাঁর কাছে ছেলেদের কূপমণ্ডূক বানানো নয়। মানবসভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞান, বোধবুদ্ধি আর মূল্যবোধের সেরা উত্তরাধিকারটা মাতৃভাষায় ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিতে চাইলেন তিনি। তার জন্য এদেশের ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গেও যেমন তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন, তেমনি সেই সেরা উত্তরাধিকারের বড়ো উৎস হিসেবে চিহ্নিত করলেন পাশ্চাত্যের শিক্ষাকে। বস্তুত যুক্তিবাদী ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তিনি এদেশের থেকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন, নিজে ধুতি-চাদর-তালতলার চটি পরিহিত সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও। আর যেমন ভাবা তেমন কাজ— নিজেই যত পারেন বইয়ের পর বই লিখে ও প্রকাশ করে এদেশে আধুনিক শিক্ষার ভিতটা তৈরি করতে উদ্যোগী হলেন। বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে যত বই তিনি লিখে গেছেন, দু-হাতে অনুবাদ (বা যাকে আডাপটেশন বলে) করে গেছেন সংস্কৃত আরা ইংরিজি থেকে, তার তুলনীয় কিছু বাঙালি পরে কোনোদিন করে উঠতে পারেনি। আমাদের সমসময়ের সঙ্গে যদি তুলনা করি কী দেখব? আজও আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত, জোর পড়ে উচ্চশিক্ষায়, যা কিনা এলিটত্বের সূচক। তাছাড়া, সাধারণ বঙ্গীয় এলিট থেকে বিদ্যাসাগরের আরেকটা পার্থক্যও মনে করিয়ে দিচ্ছি। এঁদের মতো ইংরেজি ভাষা শিক্ষা আর সেই সুবাদে কিছু কায়দাকেতা আর উচ্চমন্যতার লালন নয়, ইংরিজি ভাষাবাহিত জ্ঞান-যুক্তি আর মূল্যবোধেরই আবাহন করতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রচলিত ধরনের ভদ্রলোক-কাঙ্ক্ষিত ইংরিজি শিক্ষা সম্পর্কে তাই তাঁর মত— 'ছেলেপুলেকে আর-যা করি ইংরিজি তো কখনো শেখাব না, অসার আর ডেঁপো হবার এমন পথ আর নেই!' অনেকদিন পর পশ্চিমবঙ্গে যারা হঠাৎ একদিন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দিল, তারা কি তাহলে বিদ্যাসাগরের অনুসরণ করল? কিন্তু তারা তো বই লেখায়, অনুবাদে কোনো নজর দিল না! এইভাবে মানবসভ্যতার উজ্জ্বলতম দীপ্তি থেকে বঞ্চিত করে রাখল লাখ লাখ ছেলেমেয়েকে। ফলে এলিটদের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা দিব্যি জমে উঠল। বস্তুত অধিকাংশ নীতিনির্ধারক নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও সেই এলিট ইংরেজি শিক্ষার ইস্কুলে পাঠালেন। তাঁরা বিদ্যাসাগরের নাম নিয়েছেন বটে নিজেদের কাজের সমর্থনে, কিন্তু বলতেই হবে সে নিতান্ত অন্যায্যভাবে। তাঁদের একজনের এমন একটা যুক্তি সেদিন পড়লাম (বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে একটি লেখাতেই)— 'অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য যে ইংরেজি পড়তে হবে তা মানি। তা বলে সবাইকে? রামের মা, শ্যামের মা প্রভৃতি যাঁরা লোকের বাড়ি কাজ করে দিন গুজরান করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও? শ্রমিক-কৃষকদের সন্তানদেরও? অল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তানদেরও? অল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তানদেরও? এ যদি বিদ্যাসাগরের মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চা প্রসারের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা না হয় তো ব্যর্থতা কাকে বলব।'[১১] রামের মা, শ্যামের মা, শ্রমিক-কৃষক, অল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্তের সন্তান সম্পর্কে কি প্রবল অবজ্ঞা এই উক্তিতে! শ্রেণিস্বার্থ কী নির্মমভাবে প্রকটিত! বিদ্যাসাগরের সর্বজনীন আর সমদর্শী দরদের থেকে এই মনোভাবের কী বিরাট দূরত্ব আর

তাঁর প্রচেষ্টার কী ভীষণরকম অপব্যাখ্যা! আরো সম্প্রতি 'right to education' হয়তো বহু ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু আসল পড়াশোনাটা কি হচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের সবারই ধারণা আছে। ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্র এক লাইন শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারে না, সাধারণ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে পারে না। মনে পড়ে যাচ্ছে, ক'মাস আগে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার পরপর সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল-হওয়া একটি ভিডিওর কথা। একটি বিএ ক্লাসের মেয়ে তার সহপাঠিনীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব বিক্ষুব্ধ স্বরে বলছে— বরাবরই তারা বই থেকে টুকে পরীক্ষা দেয়, সেটাই তো নিয়ম, এবার তাদের কেন বাধা দেওয়া হয়েছে! দাবি পেশ করছে— এই অন্যায়ের যেন শীঘ্রই প্রতিকার হয়, তারা যেন আবার বই দেখে পরীক্ষার উত্তর লিখতে পারে। মেয়েটি বেশ আন্তরিকভাবে moral high ground থেকে কথাগুলি বলছে। ভিডিওটির সঙ্গে মন্তব্য ছিল— 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি কেউ ভাঙেনি। এই সেই ভিডিও যা দেখে উনি নিজেই বেদী থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেছেন।'

কৃষকভাবনা: এমন কথা কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী বলেছেন যে, বিদ্যাসাগর সমাজের দরিদ্র মানুষ তথা কৃষকদের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। একটু তলিয়ে দেখা যাক।[১২] এটা ঠিকই সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা প্রথম থেকেই ছিল কৃষকস্বার্থ বিষয়ে উদাসীন, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে যত কৃষক আন্দোলন হয়েছে, সেগুলিকে মধ্যশ্রেণির বিরোধিতারই মোকাবিলা করেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। প্রাথমিকভাবে ভূমিস্বার্থে যাদের অস্তিত্ব নিহিত (জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে) এমন একটি শ্রেণির কাছে সেটাই তো প্রত্যাশিত। পরে ভূমির ওপর নির্ভরতা কমে গেলেও মধ্যবিত্ততায় আচ্ছন্ন এই শ্রেণি দরিদ্র কৃষকের জীবন থেকে অসেতুবন্ধ দূরত্বেই অবস্থান করে। নীলবিদ্রোহে তাদের সমর্থন, পাবনার মতো আন্দোলনে আংশিক সমর্থন, পরে গান্ধীবাদী ও সাম্যবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, তেভাগা, নকশাল, সাম্প্রতিক সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম মনে রেখেও এ কথা বলছি। আর বিদ্যাসাগর? তাঁকে বর্ধমানের মহারাজা বীরসিংহ গ্রামের পত্তনিতালুক দিতে চেয়েছিলেন, তিনি সে দান প্রত্যাখ্যান করেন। প্রজাকে শোষণ করে সমৃদ্ধি অর্জনের মানসিকতা— যেটা সেযুগে ভদ্রলোকদের মধ্যে বহুব্যাপ্ত— তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি বরং চেয়েছিলেন চাষির জমি নিষ্কর হোক। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পত্রিকা সোমপ্রকাশ কৃষকবন্ধু বলে পরিচিত ছিল। নিম্নশ্রেণির প্রতি স্বশ্রেণির অবজ্ঞা দেখে কখনো বা বিদ্যাসাগরের তীব্র তীক্ষ্ণ উক্তি— 'বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণির আবার উন্নতি হইবে? যাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় জ্ঞান করি— স্বার্থসাধনের উপায়স্বরূপ মনে করি, তাহাদিগের আবার গতি ফিরিবে? সাহেবরা আমাদিগকে ঘৃণা করে বলিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা নিম্নশ্রেণিকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চোখে দেখি।' কংগ্রেসে যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বলেছেন— 'বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন। দেশের সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছে তাহার দিকে কেহই দেখিতেছে না।' সেটা ছিল আসোসিয়েশনাল রাজনীতির যুগ। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন তো জমিদারদেরই সংগঠন। ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন অনেকটা অ-জমিদার পেশাদারি ভদ্রলোকদের। তার ওপরেও কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভরসা ছিল না, তিনি তাতে যোগ দেননি। একদা অবশ্য এমন একটা জনরব শোনা গিয়েছিল যে, বিদ্যাসাগরমশাই এমন একটা কৃষকসভা বানাতে চান যেখানে জমিদাররা ঢুকতে পারবে না। এটাও আমরা জানি, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে— ১৮৬৫ সালের দুর্ভিক্ষে, 'বর্ধমান জ্বরে'-র সময়ে— হিন্দু-মুসলমান, উঁচুজাত-নিচুজাত নির্বিশেষে গরিব মানুষের মধ্যে তিনি সেবাকর্ম করেছেন। আর শেষ জীবনের সেই উক্তি তো বিখ্যাত— 'তোমাদের মতো ভদ্রবেশধারী আর্যসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল ভালো লোক!'

ভাষানির্মাণ: আধুনিক বাংলা ভাষার অন্যতম স্থপতি বিদ্যাসাগর, সে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভাষাটাকে সমাজগঠনের হাতিয়ার মনে করেই তাঁর এই নির্মাণ-প্রচেষ্টা। এমনকি উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী লিখে সংস্কৃত ভাষাটাকেও কত সোজা করে দেন, তা ভালো বাংলা শিখতে কাজে লাগবে বলে। কিন্তু বাংলা ভাষার নিজস্বতাকেও তিনি যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেন। এমন একটা ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সংস্কৃত-কণ্টকাকীর্ণ অতিকঠিন একটা ব্যাপার। তাঁর বইগুলি পড়লে কিন্তু দেখা যায়, যখন যেমন বই লিখছেন, যাদের উদ্দেশ্যে লিখছেন, তেমন করে বদলে বদলে গেছে তাঁর ভাষা। বেতাল পঞ্চবিংশতি বা সীতার বনবাসে যদি প্রচুর তৎসম শব্দ থাকে, তার্কিক চরিত্রের আবার অতি অল্প হইল-তে অনেক আরবি-ফারসি শব্দ। সমসাময়িক প্রভাবশালী লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'যাবনিক শব্দ' বলে ১৮২ শব্দের যে তালিকা তৈরি করে তাদের বাদ দিতে চেয়েছিলেন বাংলা থেকে, তার ১৪৩টি, বিদ্যাসাগর খাঁটি বাংলা শব্দ বলে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন (কসম, কবুল ইত্যাদি)। যখন যে চরিত্রের মুখে কথা বসাচ্ছেন, তখন সেই অনুযায়ী ভাষা তাঁর বদলে যায়। মেয়েদের মুখে মেয়েদের মতো কথা, পণ্ডিতের মুখে পণ্ডিতের মতো, চাষির মুখে চাষির মতো— কান পেতে সবার ভাষাই যে শুনতেন তিনি! 'যাবতীয়' কথাটা খুব ব্যবহার করতেন। কেউ একটা তাঁকে বলেন— এটা তো ব্যাকরণসম্মত নয়, হওয়া

উচিত 'যাবদীয়'। বিদ্যাসাগর জবাব দেন— 'জানি, কিন্তু যাবতীয় কথাটা বাঙলা ভাষায় অনেকদিন চলে আসছে; আমি ও বদলাতে পারব না।' তাঁর অ-তৎসম শব্দের বানানবিধি উত্তর-পবিত্র সরকার সরলীকৃত বানানবিধি মনে করিয়ে দেয়— পাখি, দিঘি সব হ্রস্ব-ই। তেমনি উজ্জোগ, উজ্জাপন।[১৩] আমাদের ১৯শ শতকীয় ইতিহাসে, বিশেষত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু ভাষাকে পরিমার্জনা করতে গিয়ে একেবারে সংস্কৃতায়িত করে তোলা হল, আরবি-ফারসি শব্দ তো বাদ গেলই, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা থেকে অনেক দূরে সরে গেল বাংলা ভাষা। বাঙালি মধ্যশ্রেণির জনবিচ্ছিন্নতা, মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্নতার এটাও একটা বড়ো দিক। আজকের বিশ্বায়িত দুনিয়ায় অবশ্য বাংলা ভাষা নিয়ে তেমন কোনো ভাবনাই বাঙালির নেই, ইংরেজির কাছেই মোটামুটি আত্মসমর্পণ করা হয়েছে। তবে যে জনবিচ্ছিন্নতা আর মুসলিম-বিচ্ছিন্নতার কথা বললাম, সেটা রয়েই গেছে।

উৎপাদনমুখিতা: সে যুগের পরম-অভিপ্রেত জমিদারি বিলাস করেননি বটে, কিন্তু আমরা জানি বিদ্যাসাগর উচ্চপদের সরকারি চাকরি থেকে প্রচুর রোজগার করেছিলেন জীবনে। আর সে যুগে উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ভদ্রলোক বাঙালির পক্ষে নিতান্ত ব্যতিক্রমীভাবে করেছিলেন ব্যবসা— যে একটামাত্র ব্যবসা তিনি করতে পারতেন, অর্থাৎ নিজে বই লিখে তার বিক্রি। হ্যাঁ, তিনি যাকে বলা যায় 'প্র্যাকটিকাল' মানুষ ছিলেন, তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি বেশ ছিল, যদিও তা সত্ত্বেও তাঁকে প্রচুর ধার করতে হয়েছিল। আসলে ব্যবসা তো নিজের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে নয়, নানা সামাজিক প্রকল্পের ব্যয়বহনের জন্য। প্রচুর রোজগার করেও তাই কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। ব্যবসা এজন্যেও বটে যে, আত্মমর্যাদার জন্য চাকরি যেকোনো সময়ে ছেড়ে দেবার পথটাও তো তাঁকে খোলা রাখতে হত। দু-দুবার চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। একবার সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত সহকারী সম্পাদক হিসেবে তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষাসংস্কার প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হলে। রসময় দত্ত সে সময়ে কাকে যেন বলেছিলেন— 'চাকরি ছাড়লে ও খাবে কী!' বিদ্যাসাগর নাকি জবাব দিয়েছিলেন— 'বলে দিও, বাজারে তরকারি বেচে খাব!' পরে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার এদেশীয় সমাজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর বিদ্যালয়স্থাপন প্রকল্পে তাদের উৎসাহও কমে যায়, ফলে ১৮৫৮ সালে তিনি সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেই বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরী বাঙালি মধ্যবিত্ত আজও প্রধানত চাকুরিজীবী।

ব্রিটিশের প্রতি মনোভাব: র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবীরা এমন অভিযোগ করেছেন যে, বিদ্যাসাগর তো ব্রিটিশ-অনুগত। এটা তো ঠিক যে, ছোটলাট হ্যালিডের মতো বেশ কিছু বড়োমাপের ব্যক্তি-সাহেবের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশের চাকরিও করেছেন দীর্ঘ সতেরো বছর— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত বা সেরেস্তাদার থেকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক, তারপর সেখানে সাহিত্যের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, তারপর ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস। কিন্তু ওই যে দেখলাম, দরকার হলে ইস্তফা দিতেও দিধা করতেন না। ব্রিটিশের সাহায্য নিয়েছেন শিক্ষাবিস্তারে তো বটেই, সাধারণভাবে সমাজসংস্কার প্রচেষ্টায়। কী করবেন? ব্রিটিশের হাতেই তখন রাষ্ট্রশক্তি। তবু মনে হয়, আজকের বুদ্ধিজীবীদের মতো রাষ্ট্র-মোহ তাঁর ছিল না। যা কিছু ভালো কাজ তা রাষ্ট্রই করবে, না করলে বা খারাপ কিছু করলে তবে শুধু আমরা তার সমালোচনা করব— বিদ্যাসাগরের কিন্তু সে মনোভাব নয়। তিনি নিজেই বড়ো বড়ো পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। সবসময়ে যে পেরেছেন তা নয়। নিজের পয়সায় মেয়েদের ইস্কুল খুলেছেন, সরকার বলেছিল সাহায্য করবে, করেনি। তবু উপায়ান্তর কী! ইংরেজের সাহায্যে বহুবিবাহের মতো সামাজিক দোষের সংশোধন কাম্য নয় এমন যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন— 'আমাদের ক্ষমতা গবর্নমেন্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়!' আর কংগ্রেসে যোগ দিতে অস্বীকার করে বলেছিলেন— 'দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয় তারা কি তলোয়ার ধরতে পারে?' আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভরসা ছিল না। এমন একটা গল্প পাওয়া গেছে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কলমে— ''একবার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা গবর্নমেন্টের কাছে কোনো এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বিষম বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'ওহে আজকে political world-এ যে বড়ই gloom দেখে এলুম।' এই গ্লুম কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন যে শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল।'' (বিদ্যাসাগরের কৌতুকপ্রিয়তা তো কিংবদন্তী!)

রাষ্ট্র বা উচ্চ রাজনীতি নয়, সমাজ বদলের চেষ্টা— রাজনীতি তাঁর কর্মক্ষেত্র নয় (মানে রাজনীতি বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি)। তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতি, কৃষক রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক বা সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী রাজনীতি, কিছুই করেননি। এসব রাজনীতির থেকে অনেক বড়ো তাঁর রাজনীতি— সে একেবারে খুব মৌলিক রাজনীতি, সর্বজনীন মানবাধিকারের রাজনীতি। আর শুধু বাহ্যিক বাগাড়ম্বরে নয়, হাটেমাঠে বারে বারে, এই জীবনের প্রাণের হাটে নেমে সে রাজনীতি করেছেন তিনি। কোনো বিশেষ দল বা সংগঠনে সে

রাজনীতি আঁটে না। সরকারি সমাজের কাছাকাছি থেকেছেন, বেসরকারি পৌর সমাজেও অনেক কিছু করেছেন। তবু সেসব চৌহদ্দিতে সীমায়িত থাকেননি। রাজনীতি, বিশেষত রাষ্ট্রের পরিসরের বাইরে যে ক্ষমতার খেলা চলে নানাভাবে, চলে সমাজ, এমনকী পরিবারের মধ্যে সেইটা আমরা আজও খুব একটা বোঝার আর মোকাবিলা করার চেষ্টা করি না।[১৪] তাতে যে নিজেদের দিকে আয়না তুলে ধরতে হয়, সে যে খুব অন্তরঙ্গ লড়াই। সে হিম্মত আমাদের নেই। বিদ্যাসাগরের সে হিম্মত ছিল। শুধু রাষ্ট্রশক্তি বা উচ্চ রাজনীতির ওপর নজর রাখতে গিয়ে আজ দেখুন সমাজটাকে আমরা কী ভয়াবহ এক শক্তির গ্রাসে ঠেলে দিয়েছি। ধর্মের নামে সে শক্তি আজ রক্তপিপাসু রাক্ষস হয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত।

ধর্মসংক্রান্ত— এই প্রসঙ্গে মনে না করলেই নয় যে, ধর্মও বিদ্যাসাগরের বিন্দুমাত্র আগ্রহের বিষয় ছিল না— যা সেযুগেও ব্যতিক্রমী, এ যুগেও। আমাদের উনিশ শতকীয় আধুনিকতা, সমাজসংস্কার ইত্যাদির সূত্রপাত তো হয়েছিল ধর্মসংস্কার দিয়েই। তাই স্থাপিত হল ব্রাহ্ম সমাজ, তারপর হিন্দু ধর্মের মধ্যেও নানা আলোড়ন, অন্তিম উনিশ শতকে চরম হিন্দুয়ানা (সে নাকি জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনে), ব্রাহ্মরাও তখন থেকে হিন্দু হয়ে যাচ্ছেন। এত ধর্ম ধর্ম করেও সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রে অনাচার রোখা গেল না, ক্রমে সাম্প্রদায়িক তিক্ততার দিকে গেল ব্যাপারটা। বাঙালির এ ইতিহাসে কিন্তু বিদ্যাসাগর একেবারেই অনুপস্থিত। তিনি কি নাস্তিক? অজ্ঞেয়বাদী? এমন গল্প শোনা যায় যে, একদা এক অন্ধ ফকিরের গান শুনে তাঁর চোখে জল এসেছিল। মনে হয়, এই গান ঠিক কোনো ধর্মীয় ব্যবস্থায় আস্থা নয়, বোধহয় একটা আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চার করেছিল বিদ্যাসাগরের মনে— বিশ্বসংসারে নিহিত কোনো অনির্বচনীয় শক্তির আভাস পেয়েও তাকে না-বোঝা ও না-পাওয়ার বেদনা জাগিয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে বেশি চর্চা করা তাঁর পোষায়নি। তাঁর বক্তব্য— 'ধর্ম যে কী, তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনো প্রয়োজন নাই।' আর প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে তো তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি— 'হা ধর্ম, তোমার মর্ম বুঝা ভার। কীসে তোমার রক্ষা হয় আর কীসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জানো।' বক্তব্য শুধু নয়, ভাষাটাও খেয়াল করতে হয়— লৌকিক মেজাজের সবল স্বতঃস্ফূর্ততায় ভরপুর! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মপ্রবণতার বাড়াবাড়ি নিয়ে মতান্তরের ফলে পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করেন। ওই পত্রিকার সম্পাদক, উনিশ শতকীয় বাংলার আরেক যুক্তিবাদী মানুষ অক্ষয়কুমার দত্ত, একই কারণে পদত্যাগ করলে সেই সমমনস্ক বন্ধুটির পাশেও দাঁড়ান বিদ্যাসাগর। কাশীতে গিয়ে নাকি বিশ্বনাথ দর্শন করেননি। আর এই প্রসঙ্গে তাঁর মায়ের কথাও বলতে হয়— যিনি কম বয়সে গ্রামের অস্পৃশ্য পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে খেলা করতেন, আর একটা সময়ে স্বামীর সঙ্গে কাশীবাসে যেতে অস্বীকার করে স্বগ্রামে সাধারণ মানুষজনের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চান। বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো বন্ধ করায় সানন্দ সম্মতি দিয়েছিলেন এই মহিলা, কারণ পুজোর খরচটা মানুষের উপকারে ব্যয়িত হতে পারবে। সেই মায়েরই ছেলে বিদ্যাসাগর— ধর্ম নয়, আদিম স্বতঃস্ফূর্ত মানবতার ধারক। আজ আমরা যারা ধর্ম দিয়েই সমাজ আর রাষ্ট্র গড়তে চাইছি অন্য ধর্মের লোকদের নিকেশ করে; কিম্বা উলটোদিকে আরো আরো ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে সেকুলার হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি, এ মনোভাবটা তারা বুঝবই না। জগদ্ধাত্রী পুজো প্রসঙ্গেই বলি— আমাদের ছোটোবেলায় জগদ্ধাত্রী পুজো ছিল হাতে-গোনা, তারপর ক্রমে তার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১০ হাত অন্তর প্যান্ডেল। আশা করি, ক্রমে আরো বেশি করে দেখব এবং দেখে বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের গর্বে আপ্লুত হয়ে উঠব। সেই আমরা বিদ্যাসাগরের কে, আর বিদ্যাসাগরই-বা আমাদের কে!

বিদ্যাসাগরের কাজকর্মের কতটা সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই, কতটা সমাজের সঙ্গে সমঝোতা, কতটা সমাজ থেকেই পাওয়া মানসিকতার ফল, সেসব নিয়ে তর্ক হতেই পারে এবং কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও মুশকিল। তবে আমি তাঁকে যতটুকু বুঝেছি, বাঙালির কথায় আর কাজে ফাঁক আর ভণ্ডামি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তার মানে এই নয় যে তাঁর স্ববিরোধিতা ছিল না। সেটা কিন্তু খানিকটা কৌশলগত কারণে। যেহেতু তিনি নিজের মনের মধ্যে নিজের আবেগ ও আদর্শকে রেখে দিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকার পাত্র ছিলেন না, যেহেতু তিনি বৃহত্তর জগতে তার রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছিলেন, ফলে বাস্তববাদী হয়ে তাঁকে নানারকম সমঝোতা করতেই হয়েছিল। তাই বিধবাবিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছেন বারেবারে, নিজের মানবতা আর যুক্তিকে সরিয়ে রেখে। সেটা রক্ষণশীল সমাজকে মানানোর জন্য। বলেইছিলেন, সমাজ তো নিছক যুক্তির কথা শুনবে না। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ আর বৈশ্য ছাড়াও অন্যদের প্রবেশাধিকার দিতে তো চেয়েছিলেন, যদিও শুধুমাত্র কায়স্থদের দিয়েই শুরু করলেন। জানতেন শূদ্রদের তখনই সমাজ মেনে নেবে না। এমনকী কায়স্থদের ভর্তি নিয়েও তো কম বিরোধিতা হয়নি! ১৮৬০ সালে সরকার থেকে একদম গরিবদের জন্য সস্তার স্কুল খোলার একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছিল বিদ্যাসাগরসহ কিছু নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোকের কাছে। সকলেই তাতে আপত্তি করেন। বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের আপত্তির কারণ হিসেবে বাস্তব পরিস্থিতির কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, খেটে-খাওয়া

গরিবের অবস্থা এদেশে এতই খারাপ যে তাদের পরিবারের ছেলেদের ভালো করে পড়াশোনা করা সম্ভবই নয়; এতে তাদের শ্যামও যাবে, কূলও যাবে; পুরোপুরি অবৈতনিক শিক্ষা হলে তবু এই প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। তাঁর মতে, একশটা ছেলেকে ওইরকম দায়সারা পড়াশোনা করানোর চেয়ে একটা ছেলেকে ভালো করে পড়ানো ভালো। নিজের গ্রাম বীরসিংহে কিন্তু (হয়তো পরিস্থিতি সেখানে খানিকটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল বলেই) তিনি বিশেষ করে চাষিদের ছেলেদের জন্যে স্কুল খুলেছিলেন। আর দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে তাঁর অনুভূতির কথা তো আমরা আগেই আলোচনা করলাম।

সুমিত সরকার বিদ্যাসাগরের এই বাস্তববাদিতা ও কৌশলী সমঝোতার দিকটা খুব ভালো করেই প্রতিপন্ন করেছেন।[১৫] অবশ্য ব্রায়ান হ্যাচারের অন্যরকম বক্তব্য।[১৬] বিধবাবিবাহ নিয়ে তর্ক প্রসঙ্গে হ্যাচার বলেন, শাস্ত্র বিদ্যাসাগর নিজেও যে মানতেন না তা নয়। হ্যাচার এও বলেছেন, তাঁর যে প্রচণ্ড ক্রোধ, আত্মাভিমান— যা অবশ্যই একটা নৈতিক শ্রেষ্ঠতার বোধের সঙ্গে জড়িত— সেও অনেকটা এসেছিল নিজের ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠতার প্রত্যয় থেকে। বিদ্যাসাগরের বিপুল দম্ভ ও দাপটের কথা হ্যাচার বারেবারেই বলেছেন— যা তাঁকে অনেক প্রিয়জনের প্রতিও রীতিমতো নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। তিনি আরো বলেছেন, অন্ধ ফকিরের গান নিয়ে তাঁর আপ্লুত হওয়াও বেশ ভদ্রলোকসুলভ— সে যুগের ভদ্রলোকরা বাউল-ফকিরে খুবই আগ্রহী হচ্ছিলেন একটু অন্যরকম মানবধর্মী ভাবাবেগের চর্চা করার জন্য, একই সঙ্গে বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক ভারতীয় আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে। হ্যাচারের সব কথা আমরা নাই মানতে পারি। বরং আমার সুমিত সরকারের দেখাটাই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তিনি বলছেন, বিদ্যাসাগর নিজে এসেছিলেন মধ্যশ্রেণির একেবারে নিচের একটা স্তর থেকে, সেকেলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও যুগের নবলব্ধ সুযোগসুবিধের সদ্ব্যবহার করে (শিক্ষা, চাকরি, মুদ্রণ সংস্কৃতি) তিনি সমাজে মান্যতা পেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন ঠিক তাঁর মতো করেই 'দরিদ্র অথচ ভদ্র' (যারা অধিকাংশত উচ্চবর্ণও) পরিবারের ছেলেরা জীবনে উন্নতি করুক। হ্যাঁ, পার্থিব অর্থেই উন্নতি— আগেই তো বলেছি বিদ্যাসাগরের বৈষয়িকতার কথা। আর হ্যাঁ, ব্যক্তিগত উন্নতিও বটে, যেটাকে হ্যাচারের মনে হয়েছে bourgeois individualism-এর মতাদর্শ। কিন্তু এটুকু স্বীকার করতেই হয় যে, অন্তত বিদ্যাসাগরের নিজের বেলায় সেই বৈষয়িকতা ও ব্যক্তিবাদ আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, সামূহিক হিতচিন্তায় নিবেদিত। তবু হয়তো এটাও মেনে নিতে হবে, তাঁর যাবতীয় কর্মোদ্যোগে আপামর জনসাধারণ নয়, মধ্যশ্রেণির ওই অসচ্ছল স্তরটাই প্রাথমিকভাবে উদ্দিষ্ট ছিল। সেদিক থেকে তাঁর শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এমনটাও মনে হয় যে, প্রধানত মধ্যশ্রেণির পরিসরে কাজকর্ম করলেও, তাঁর প্রসারিত উদার হৃদয়বত্তার কারণে সেসব কাজের তাৎপর্য কিন্তু শেষপর্যন্ত শ্রেণিসীমানা অতিক্রমী। তাঁর শিশুপাঠ্য বইগুলিতেও তিনি বারে বারে যে যুগোপযোগী নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছেন— দেখিয়েছেন কীভাবে শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিশ্রম ইত্যাদি সদ্‌গুণের সাহায্যে পিছিয়ে-থাকা গরিব পরিবারর ছেলেরা জীবনে বিকাশ লাভ করতে পারে— সেসবের মধ্যেও ছিল স্বশ্রেণির সীমা ছাপিয়ে মুসলমান বা নিচুজাতের মানুষেরও প্রেরণা জাগার সম্ভাবনা। সুমিত সরকারের মতে, বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষণার তাগিদ কোনো বিমূর্ত চিন্তা নয়, নিজের পরিপার্শ্বের সঙ্গে সহমর্মিতা থেকেই এসেছিল; এবং সেখানেই তাঁর শক্তি। আবার সেটা তাঁর দুর্বলতা ও ব্যর্থতারও উৎস, কারণ তাঁর চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের সঙ্গে সেই পরিপার্শ্বের অন্বয় হল না। এই 'dialectic of affinity and difference' বিশ্লেষণ করে সুমিত সরকার চমৎকার বলেছেন, '... he soared, we might say, but refused to roam'; তাই তাঁর ট্র্যাজেডি।

কিন্তু আমি গোড়াতেই বলেছি, এই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগরকে বোঝার জন্য ততটা নয়, যতটা বাঙালিকে (বাঙালি মধ্যশ্রেণিকেই) তাঁর আয়নায় ফেলে দেখার জন্য। আমরা কে কাকে কতটা বুঝে উঠতে পারি, এমনকী নিজেকেই-বা নিজে কতটা বুঝি, যে বিদ্যাসাগরকে নির্ভুলভাবে বুঝে ফেলব! তবে এটা ঠিকই যে, বিদ্যাসাগরের সব আপাত-সমঝোতা কৌশল নাও হতে পারে। সত্যিকারের অন্তর্বিরোধও খানিক ছিল বলে মনে হয়। এবং এটাও অনেকাংশে বাঙালি সমাজের সঙ্গে তাঁর বৈপরীত্যকে প্রকটিত করে। আমার মনে হয়, এটা হয়তো অনেকটা এসেছিল পরিবারের প্রতি তাঁর টান থেকে। এই জায়গাটায় তিনি সত্যি করেই একটু ঠেকে গিয়েছিলেন। তাঁর বাবা-মাই যে তাঁর দেবতা— বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণা— সেকথা তো বলেইছিলেন (কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শনে অস্বীকৃত হয়ে)। তাঁর সব কর্মকাণ্ডে পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই চলতে চাইতেন। এখানেও কিন্তু সাধারণভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য লক্ষণীয়। আজও তো দেখি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা বাইরে যাই বলুক, পারিবারিক স্তরে যত ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক আচারবিচার সব মেনে চলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, তাঁর পিতা না মানলে বিধবাবিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ তিনি নিতে পারতেন না। পুত্রের জেদের কাছে পিতা হার মেনেছিলেন, কিন্তু খুশি হয়ে মানেননি।

সে এক অশান্তি। পুত্রের কুখ্যাতিতে বিড়ম্বিত পিতা কাশীবাসী হলেন। ঠাকুমা যখন মারা গেলেন, পিতা

ভেবেছিলেন ব্রাহ্মণরা সব শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বয়কট করবেন। পিতাকে খুশি করতে বিদ্যসাগর সেই অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ঢালেন। ব্রাহ্মণদের খুশি করার জন্যও। তাছাড়াও বাংলার নারীশিক্ষার পথিকৃৎ মানুষটির পিতার আপত্তির জন্যই নাকি নিজের স্ত্রী ও কন্যাদের লেখাপড়ার জন্য কোনো উদ্যোগ নেননি। সমগ্র পরিবারকে, ভাই, ছেলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চাইলেও তাঁকে কিন্তু পরিবারের দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেতে হয়— ভাইরা কেউ তাঁর কাজকর্মে বিরক্ত, কেউ শুধু তাঁর টাকাকড়ি চিনে নিয়ে তা ঠকিয়ে নিতে চায়। ছেলের সঙ্গেও বনিবনা হয় না। শেষ জীবনে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

কর্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের নিয়ে তাঁর যে অন্তিম পর্ব, সেখানে বাড়ি করা, হ্যাচার মনে করিয়ে দিয়েছেন, এক্ষেত্রেও বাঙালি ভদ্রলোকি আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন— শহুরে জীবনের চাপ থেকে দূরে অবসরযাপন ও স্বাস্থ্য ফেরানো যার লক্ষ্য। এইজন্যই তো রেল চালু হলে জামতাড়া, মধুপুরের মতো জায়গাগুলোতে বাঙালি ভদ্রলোকদের ভিড় বাড়তে থাকে। এই দুই জায়গারই মাঝামাঝি কর্মাটাঁড়ের অবস্থান। কিন্তু বিদ্যাসাগর যেভাবে সাঁওতালদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন, সেটা অন্য কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে চট করে সম্ভব হয়নি। সাঁওতালরা, যারা বাইরের লোকদের হাতে অনবরত শোষিত হতে হতে তাদের সন্দেহের চোখেই দেখত, কী আশ্চর্য, তারাও এই মানুষটিকে কত ভালোবেসে গ্রহণ করে! থ্যাচার এও বলেছেন যে, বিদ্যাসাগরের দিক থেকে এটা তাঁর পিতৃমনোভাবাপন্ন সদাশয়তার পরিচয়। তবু কোথাও হ্যাচারেরও মনে হয়েছে, এটা বললেই ব্যাপারটার সঠিক বর্ণনা হয় না— 'Their roles are not merely given but point to the possibility for creating new kinds of social arrangements.' (অর্থাৎ কোথাও একটা সমাজব্যবস্থাটাকে পালটানোর সম্ভাব্যতা জাগছিল) From this new vantage point, being a friend of the poor moves away from traditional frameworks surrounding "duty" toward modern conceptions of human responsibility.'[১৭] এরপরেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়— এ কি একটা আধুনিক ধারণা, নাকি ইতিহাস-নিরপেক্ষ চিরন্তন মানবতা? ওই যে আগেই বললাম, আমার তো মনে হয় তাঁর ইতিহাসসম্পৃক্ত শ্রেণিচরিত্র অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার আগেও মনুষ্যত্ব, পরেও মনুষ্যত্ব।

তার ফলে অবশ্য ব্যর্থতা আর আত্মগ্লানিই তাঁর ভবিতব্য ছিল। যে বিধবাবিবাহকে তিনি তাঁর নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মোদ্যোগ মনে করতেন, আমরা জানি তা মোটেও সমাজসিদ্ধ হয়নি। সে যেন তাঁরই কন্যাদায়! যাঁরা বিধবা বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর দেওয়া যৌতুকের লোভেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই উক্তি তো বিখ্যাত— 'আমাদের দেশের লোক এত অসাড় ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনোই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।'

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জন্য তাঁর প্রচুর ঋণও হয়েছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিয়ে চাঁদা তুলে তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। শুনে তিনি খুব রেগে যান। লেখেন— 'the national object for which I am laboring has been so much mixed up with me personally that I must protest against the move under notice.' হ্যাচার সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক নিয়ে যে কথাটা বলেছেন, মানে ওই পিতৃসুলভ সদাশয়তার কথা, আজকের নারীবাদী দৃষ্টি থেকে হয়তো বলাই যায় যে মেয়েদের জন্যে তাঁর কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও সেই মনোভাবই কাজ করেছে, মেয়েদের সার্বিক অধিকারের কোনো চেতনা নয়। কিন্তু অন্তত তাঁর বিধবাবিবাহ প্রকল্পের র‍্যাডিক্যালিজমটাও মাথায় রাখা ভালো।[১৮] অনেক বছর পেরিয়ে এসে বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহ আজ আর সমাজমান্য নয়, কিন্তু বিধবাবিবাহ নিয়ে আজও সংশয় থেকে গেছে মানুষের মনে; কারণ নারীর যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজের যে মূলগত তাগিদ বিধবাবিবাহের ধারণা তাতে খুব বড়োসড়ো আঘাত করে।

সব মিলিয়ে শেষ জীবনে মানুষটা তাই একেবারে নিঃসঙ্গ— স্বশ্রেণি থেকে, পরিবার থেকেও একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন নিজেকে। সেই সময়ের তাঁর সেই তীব্র ধিক্কার আমাদের কানে-প্রাণে এসে আছড়ে পড়ে— 'এ দেশের মুখে ছাই; এ দেশের সর্বপ্রধান সমাজের মুখে ছাই!' রক্ষণশীল মধ্যশ্রেণির সমাজের প্রতি তাঁর চিৎকৃত ঘৃণা!

কিন্তু শুধু রক্ষণশীল কেন, আপাত-প্রগতিশীলদের প্রতিও নয় কি? অশোক সেনের বই থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ব্যালেন্টাইনের বিরোধের গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে।[১৯] বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ইংরেজি বিদ্যাকে প্রাধান্য দিতে চান। সাংখ্য-বেদান্ত পড়ুক ছাত্ররা, কিন্তু সেসবের যা কিছু ভ্রান্তি, তার প্রতিষেধক হিসেবে পাশ্চাত্য দর্শনও পড়ুক। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন কিন্তু কলকাতায় ইন্সপেকশনে এসে সংস্কৃত কলেজের উন্নয়নকল্পে তাঁর রিপোর্টে বললেন— পাশ্চাত্য ও হিন্দু পদ্ধতির মিশ্রণে ছাত্রদের ভুল ধারণা হতে পারে যে 'সত্য দ্বিবিধ'। বরং হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি আছে এমন কিছু বাছাই ইংরিজি বই ছাত্ররা পড়তে পারে। বিদ্যাসাগরের পালটা যুক্তি— খুব কম ক্ষেত্রেই হিন্দুশাস্ত্র আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সামঞ্জস্য দেখানো যায়, জোর করে তা দেখানোর কোনো মানে হয় না। ছাত্ররা দুটোই পড়ুক, বুদ্ধিমান

ছাত্র নিজে বুঝে নিক দুয়ের মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় অমিল, কোনটা সে নেবে, কোনটা নেবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ছাত্ররা তথা আমাদের শিক্ষিত শ্রেণি, অর্থাৎ যারা এদেশে আধুনিক সমাজচিন্তার নেতৃত্ব দিল, তারা বোধহয় তেমন বুদ্ধিমান ছিল না এবং কোনোদিন হয়েও উঠল না। তাদের ক্ষেত্রে বোধহয় ব্যালেন্টাইনের আশঙ্কাটাই সত্যি হল। তারা বুঝে নিল— 'সত্য দ্বিবিধ'। তাই আমাদের সত্য দ্বৈধতায় আচ্ছন্ন। তাই যাকে সত্য বলি তার প্রক্রিয়া অনুসরণ ও তার নির্যাস সন্ধানে, তার মুখ ও মুখোশে বিস্তর ব্যবধান (ধরা যাক, আমাদের গণতন্ত্র)। তাই হয়তো যে বিদ্যাসাগর এত মানবিক ও যুক্তিবাদী, তাঁকেও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিধবা বিবাহের পক্ষে সামাজিক সহমত তৈরির চেষ্টা করতে হয়।

আজ আমাদের কথায় কথায় শাস্ত্র আওড়াতে না হলেও নানাভাবে দু-কূল বজায় রেখে চলতে হয়। আজও আমাদের বিভ্রান্ত মূল্যবোধ, দ্বিধাগ্রস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই দ্বৈধতাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এটা অশোক সেনদের পুরোনো ব্যাখ্যায় ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু আসলে হয়তো এর শিকড় আমাদের সামূহিক জীবনের আরো গভীরে। এ. কে. রামানুজন একটি প্রবন্ধে এটাই বলতে চেয়েছেন।[২০] তিনি ভারতীয় চিন্তার context-sensitive বা প্রসঙ্গ-সাপেক্ষ চরিত্রের কথা বলেছেন। বলেছেন— সব সমাজেই context-sensitivity থাকে, কিন্তু অন্তত কিছু মূল ভাবনাচিন্তা থাকে যেগুলি context-free, সর্বজনীন মূল্যবোধের সন্ধানী। ভারতীয়দের কোনো সর্বজনীনতার বোধই নেই, সর্বজনীন মানবতা ও নৈতিকতার ধারণা নেই (তাঁর মতে জাতিভেদ দ্বারা আচ্ছন্ন সমাজদৃষ্টি এর জন্য অনেকটা দায়ী— যেমন ভারতীয়রা যখন সাহস ও বীরত্ব নিয়ে মুগ্ধতাজ্ঞাপন করত, সেটা করত শুধু ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রেই)। এখানে context-free ধ্যানধারণা এল আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায়। কিন্তু তখন context-sensitive থেকে context-free-র দিকে যাত্রা করতে করতে (যেমন মনুসংহিতার জায়গায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হওয়া) যেটা হল— 'Indian borrowings of Western cultural items have been converted and realized to fit pre-existing context-sensitive needs'। তখন আধুনিকটাই হয়ে গেল আরেকটা কনটেক্সট। কিছুদিন আগে 'গোত্র' সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিলাম। বদমাইস প্রোমোটার, যে মুসলমানের হাতে জন্মাষ্টমীর ভোগ পরিবেশন নিয়ে আপত্তি তোলে ও ভোজসভা ভণ্ডুল করে দেবার উপক্রম করে, তাকে সেই ভোজসভার আয়োজক কেন্দ্রীয় মহিলা চরিত্রটি (এঁরই বাড়িটি বাগানোর ধান্দা সেই প্রোমোটারের) মনে করিয়ে দেন আরসালানের বিরিয়ানির প্রতি তার প্রবল প্রীতির কথা, যে বিরিয়ানি মুসলমানের হাতে রান্না হয়। কিন্তু আরসালানের বিরিয়ানি খাওয়া আর জন্মাষ্টমীর ভোগ খাওয়ার কনটেক্সট তো আলাদা, আর আমরা সবাই তো স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন কনটেক্সটে বিভিন্নরকম চিন্তা ও আচরণ করে থাকি। এই মহিলা চরিত্রটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষায় বিরাট এক বক্তৃতা দিলেন। কোথাও কোথাও জন্মাষ্টমীতে মুসলিমদের অংশগ্রহণের বহুদিনের ঐতিহ্য আছে, এসব কথা বললেন। সেটা জেনে আপ্লুত হয়েও কিন্তু অন্য কনটেক্সটে— যেমন দেশের অর্থনৈতিক দূরবস্থা প্রসঙ্গে— মুসলিমদের জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে দায়ী করা কোনো ব্যক্তির নাও আটকাতে পারে এবং সে তখন কোনো বিশেষ রাজনীতির প্রেরণায় দেশ থেকে মুসলিম বিতাড়নের সংকল্প নিতে পারে। তাই মনে হয়, আরো বেশি করে জন্মাষ্টমী তথা পূজাআর্চা করে (তাতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ থাকলেও) হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনে খুব একটা সুবিধে না হবারই কথা। বরং হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি বিভাজক পরিচয়গুলিকে অতিক্রম করে একটা সর্বজনীন মানবতার ধারণা যদি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাতেই মঙ্গল।

আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর এমন একজন মানুষ যাঁর মানবতা প্রধানত স্বশ্রেণিতে ক্রিয়াশীল হয়েও ছিল অনেকটাই context-free এবং সর্বজনীনতায় মণ্ডিত। কনটেক্সট বুঝে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার চর্চা নয়, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা দুটোকেই নিজের বোধবুদ্ধি অনুযায়ী বদলে নিয়ে মেলাতে চেয়েছিলেন তিনি একটা সুস্থ সুন্দর সমাজের লক্ষ্যে; এবং context-free ও সর্বজনীন বলেই সেই প্রক্রিয়ায় গরিব ও পিছিয়ে-থাকা মানুষদের সঙ্গে (স্বশ্রেণি শুধু নয়, তার বাইরেও) ইঙ্গায়িত সমৃদ্ধ এলিটদের ব্যবধানও ঘোচাতে চেয়েছিলেন। আমাদের সমাজ জীবনে সেই শ্রেণিগত ব্যবধান কিন্তু দিন দিন বাড়তেই থাকল এবং আজও তা অত্যন্ত প্রকট। আজ তো চারদিকে তাকিয়ে যেন মনে হয়— ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, পশ্চাৎপদ ও প্রাগ্রসর, ধনী ও দরিদ্র এসব দ্বৈধতার বর্গ যেটুকু মিলেছে আমাদের দেশে, তা শুধু উগ্র অসহিষ্ণু হিন্দুত্বের প্রণোদনায়; বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধুসন্ত আর এনআরআই হিন্দুদের মিলন তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।[২১] বিদ্যাসাগরের অবস্থান অবশ্যই সেই হিন্দুত্বের বিপরীত মেরুতে।

আরেকটা কথাও জোর দিয়ে বলতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগর যে অনেকটাই এইসব ইতিহাসজাত দ্বৈধতার ঊর্ধ্বে ছিলেন শুধু তাই নয়, কিছু ইতিহাস-নিরপেক্ষ চারিত্রিক গুণের দৌলতে তিনি ইতিহাসের পুতুল হয়ে না থেকে ইতিহাসকে চালিত করতে চেয়েছিলেন নিজের সমাজ ও দেশের হয়ে। বাঙালির কিন্তু এমত দ্বৈধতাচ্ছন্ন জীবনচর্যায় ও মননচর্যায়

বিলক্ষণ ফাঁকিবাজি রয়ে গেল; ফলে সমাজের রূপান্তরও তার অধরা থাকল। আমাদের সমাজে অল্পবিস্তর সংস্কারসাধন নিশ্চয়ই হয়েছে— বস্তুত বিদ্যাসাগরের সমকালীন সমাজের থেকে আমাদের আজকের সমাজের আকাশ-পাতাল তফাতই চোখে পড়বে— কিন্তু আমি বলতে চাইছি, সব মিলিয়ে সামাজিক রূপান্তর যা হল সেটা নেহাত ইতিহাসের ধারা বেয়ে, আমাদের এজেন্সিতে ততটা নয়। আমরা ইতিহাসের হাতের পুতুল হয়েই রইলাম।

তাই ইতিহাসের কাছে বিদ্যাসাগরও যেমন পরাভূত হলেন (অনেক লড়াই করে), তার চেয়ে বেশি করে পরাজিত হলাম আমরা, বাঙালিরা (আমরা একেবারে আত্মসমর্পণই করলাম)। তাই আমরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি বেদীতে রেখে পুজো করতে পারি বা সেই মূর্তির মুণ্ডপাত করতে পারি বটে, কিন্তু আসল বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে অধরাই থেকে যান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালির আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো elusive milestone।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। আগে নাম ছিল মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন

২। দেখা যেতে পারে বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, তিন খণ্ড, কলকাতা থেকে ১৯৫৭, '৫৮ ও '৫৯ সালে প্রকাশিত।

৩। বদরুদ্দীন উমর, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত *বিদ্যাসাগর*, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭১।

৪। Asok Sen, *Vidyasagar and his Elusive Milestones*, Riddhi-India, Calcutta, 1977.

৫। Brain A. Hatcher, *Idioms of Improvement: Vidyasagar and Cultural Encounter in Bengal*, OUP, 1996; *Vidyasagar: The Life and After-life of an Eminent Indian*, Routledge, New Delhi and Abingdon, Oxon, 2014.

৬। Sumit Sarkar, 'Vidyasagar and Brahmanical Society' in *Writing Social History*, OUP, Delhi, 1997.

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগরচরিত', ১৮৯৫, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৪০, ১৯৭৫।

৮। V. C. Joshi ed. *Rammohun Ray and the Process of Modernization of India* বইতে এঁদের প্রবন্ধ। এছাড়া অশোক সেনের বিদ্যাসাগর বিষয়ক পূর্বোক্ত বই।

৯। *বাংলায় নবজাগরণের সঙ্গতি অসঙ্গতিতে বিদ্যাসাগর*, অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৩।

১০। এ তথ্যের উৎস প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, 'বিদ্যাসাগর ও বেসরকারি সমাজ', *যোগসূত্র*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

১১। সবুজ সেন, 'মূর্তি গড়া-ভাঙার আলো-আঁধারে বিদ্যাসাগর', *যোগসূত্র*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

১২। এই তলিয়ে দেখার ক্ষেত্রে প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সাহায্য অবশ্য-স্বীকার্য।

১৩। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ভাষা নিয়েও ভালো আলোচনা আছে।

১৪। এই প্রসঙ্গে বলি, বিদ্যাসাগর কিন্তু ঐতিহ্যিক যৌথ পরিবারের মোহে মুগ্ধ ছিলেন না। দ্রষ্টব্য সুমিত সরকারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

১৫। সুমিত সরকারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ — 'Vidyasagar and Brahmanical Society in *Writing Social History*.'

১৬। হ্যাচারের *Vidyasagar: The Life and After-life of an Eminent Indian.*

১৭। হ্যাচারের পূর্বোক্ত বই।

১৮। এটা সুমিত সরকার মনে করিয়ে দিয়েছেন।

১৯। *Vidyasagar and his Elusive Milestones.*

২০। A. K. Ramanujan, 'Is there an Indian Way of Thinking?' in McKim Marriott, *India through Hindu Categories*, Sage Publications, 1990.

২১। এটা সুমিত সরকারেরও পর্যবেক্ষণ।

এই প্রবন্ধে আর যেসব তথ্য বা উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের অধিকাংশই পাওয়া যাবে ওপরের বই ও প্রবন্ধগুলিতে। তবে, বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর বিষয়ে আমার ধারণার ভিত্তি এগুলি ছাড়াও ছোটোবেলা থেকে পড়া বিদ্যাসাগরের প্রচুর লেখা এবং তাঁকে নিয়ে লেখা বেশ কিছু বই (যেমন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিদ্যাসাগর* এবং ইন্দ্র মিত্রের *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*)।

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে

পেরেস্ত্রৈকার শেষ বছর

অরুণ সোম

এক

লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লবের ভাবমূর্তি

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১। মস্কোর কেন্দ্রস্থলে লেনিন মিউজিয়ামকে ঘিরে জটলা চলছেই। এটা যেন একটা স্থায়ী বিতর্ক সভার চেহারা নিয়েছে। স্মৃতিসৌধের শবাধারে শায়িত লেনিনকে দেখতে প্রচণ্ড ভিড়। এত ভিড় গত বসন্তেও দেখিনি। এত মানুষ দেখতে আসছে কিন্তু তাঁকে এখানে রাখা হবে না পের্তেবুর্গে তাঁর মায়ের পাশে সমাধিস্থ করা হবে তা নিয়ে বিতর্ক চলছেই। অসংখ্য মানুষ সারাদিন পিকেট করে বসে আছেন যাতে রাতের আঁধারে লেনিন শবাধার স্থানান্তরিত হয়ে না যায়, পিকেট করে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন লেনিনবাদী কমিউনিস্ট হিসেবে। সরকারি হুকুমনামায় নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কিছু এঁরা বলছেন না। প্রকাশ্য কট্টর স্তালিনবাদী আন্দ্রেইভাও এঁদের সঙ্গে নেই। তবে কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন, বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ প্রকাশ্যেই 'লেনিনবাদী কমিউনিস্ট'-দের সঙ্গে আছেন। এঁরা অধিকাংশই প্রবীণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পিতৃভূমি রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। বলছেন লেনিন স্মৃতি রক্ষায় দরকার হলে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। ইতিমধ্যে গড়েছেন একটি জাতীয় কমিটি, তহবিল ইত্যাদি। পিকেটের স্থলে এঁদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম কারণ পুলিশ ঘিরে রয়েছে। এবার লেনিন স্মৃতিসৌধে এত ভিড় হচ্ছে তার একটা কারণ সম্ভবত আশঙ্কা। কারণ পের্তেবুর্গের মেয়র সবচাক ঘোষণা করেছেন লেনিনের শবদেহ তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর মায়ের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করতে হবে সম্পূর্ণ ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে। এতেই নাকি লেনিনের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু এই শেষ ইচ্ছার উইল কার কাছে আছে বা আদৌ তেমন শেষ ইচ্ছা ছিল কি না তা জানা যাচ্ছে না। অন্য দিকে মস্কোর মেয়র 'ডি ডে' দিয়েছেন ১ অক্টোবর। তাঁর দাবি ওই দিনের আগে স্মৃতিসৌধের জায়গা-জমি মস্কোর পুরসংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে। তবে লেনিনের গায়ে হাত তোলার আগে সম্ভবত মার্কস-এঙ্গেলসের গায়ে হাত উঠে যাবে। এঁদের স্মৃতিগুলোর গায়ে অশ্লীল গালিগালাজও লেখা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীরা এটা পছন্দ করছেন না। কিন্তু কিছু 'সাধারণ মানুষ' সোৎসাহে এসব চালিয়ে যাচ্ছেন। উৎসাহের মাত্রা দেখে মনে হচ্ছে এখনও বেশ কিছুদিন তা চলবে।

২৩ অক্টোবর, ১৯৯১: আগস্টের ব্যর্থ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের সময় যে তিন জন গণতন্ত্রী রেড স্কোয়ারে ট্যাঙ্কের তলায় চাপা পড়ে নিহত হয়েছিল তাদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে ১ নভেম্বর দিনটিকে গোটা সোভিয়েতে 'শোকদিবস' হিসেবে পালন করার দাবি জানিয়েছে রুশ ডেমোক্রেটিক ও রুশ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি। ওই দিন নিহত ব্যক্তিদের উদ্দেশে তর্পণ করা হবে লুবিয়ান্কা স্কোয়ারে (এই সেদিনও যার নাম ছিল দ্‌জের্‌জিন্‌স্কি স্কোয়ার) যেখানে কেজিবি-র সদর দপ্তর অবস্থান করছে। বেরোবে একটি শোভাযাত্রাও। বলশেভিক বিপ্লবের আগে মস্কোর যে-জায়গায় ছিল একটা প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন চার্চ, শোভাযাত্রাকারীরা সেখানেই মিলিত হবেন একটি প্রার্থনা সভায়। রুশ ডেমোক্রেটিক ও রুশ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির আরো একটি দাবি: ১ নভেম্বরেই সমাধিস্থ করা হোক লেনিনকে। বলা বাহুল্য, কাজটি করতে চাওয়া হয়েছে প্রতীকীভাবে। লেনিনের দেহ নয়, তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তিকেই সমাহিত করা হবে ১ নভেম্বর। দাবিগুলি জানানো হয়েছে রুশ প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত সরকারের কাছে। সম্মতি মেলেনি এখনও। তবে দাবিগুলি মেনে নেওয়া হবে বলেই সকলের ধারণা। রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েল্‌ৎসিনের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীও তাই মনে করছেন। এদিকে ৭ নভেম্বর রেড স্কোয়ারে এবার 'অক্টোবর বিপ্লব দিবস' উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না সরকারিভাবে। তবে ওইদিন রেড স্কোয়ারে ও তার আশেপাশের এলাকায় গোলমালের আশঙ্কা করছেন রুশ প্রশাসনের একাংশ। ওদিকে মস্কোর মেয়রের নির্দেশমতো ১ অক্টোবরেই রেড স্কোয়ার এলাকা থেকে লেনিন মিউজিয়ামটি সরিয়ে নিয়ে

যাওয়ার কথা ছিল। সম্ভব হয়নি। হবে কী করে? তিন-চার দিন আগে থেকেই মিউজিয়ামের সামনে সমবেত স্বেচ্ছাসেবী প্রহরীর হাতে হাতে ঘুরছিল নানা ফেস্টুন। সাদা রঙের সেইসব ফেস্টুনের কোনোটিতে লাল অক্ষরে লেখা 'লেনিন আমরা তোমাকে ভুলিনি', কোনোটিতে 'আমরা আবার ফিরে আসব', কোনোটিতে আবার মায়াকোভস্কির কবিতা থেকে তুলে দেওয়া উদ্ধৃতি 'লেনিন ছিলেন, আছেন, লেনিন থাকবেন।' ফেস্টুনের ছবি ছাপিয়ে তার খবর করেছিল এখানকার কাগজগুলো।

জুড়ে দিয়েছিল মন্তব্য: 'ওরা এখনও সশস্ত্র নয়, তবে একদিন ওরাও...' সশস্ত্র হাঙ্গামার ভয়ে ওই মিউজিয়ামটিকে ঘিরে এখনও রয়েছে চাপা উত্তেজনা। রয়েছেন ফেস্টুনধারী স্বেচ্ছাসেবী প্রহরীরা। আর হ্যাঁ, ১ অক্টোবরের পরেও ওখানে রয়েছে মিউজিয়ামটি। স্বেচ্ছাসেবী প্রহরীদের সঙ্গে কথা বলব বলে একদিন গিয়েছিলাম সেখানে। গত সপ্তাহে। ভাব জমালাম এক প্রহরীর সঙ্গে। প্রশ্ন করলাম, দৈনিক কত জন এখানকার স্বেচ্ছাসেবী প্রহরী দলে নাম লেখান, বিনা পারিশ্রমিকে কত জন এখানে রাতভর পাহারা দেন মিউজিয়ামটিকে, প্রহরী হতে যাঁরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন সমাজের কোন শ্রেণির মানুষ তাঁরা। এখনও সোভিয়েতে এ ব্যাপারে কারও আগ্রহ আছে দেখে মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার প্রহরীবন্ধুটির। সবে উনি আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে যাবেন, এমন সময়ে কোত্থেকে যেন উড়ে এসে আমাদের ঘিরে ফেলেই অশ্রাব্য গালাগালি দিতে লাগল আমাদের। রেহাই পেলেন না লেনিনও। তাঁকে দেওয়া হল 'খুনে' 'বর্বর' উপাধি। হই-হই করে এগিয়ে এলেন অন্য প্রহরীরা। শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি, স্লোগান, পালটা স্লোগান। হট্টগোলের মধ্যেই স্বেচ্ছাসেবী দলের এক বৃদ্ধা নিঃশব্দে বিলি করে যাচ্ছিলেন লিফলেট। দুঃস্বপ্নের রাতগুলোতে লেনিন কীভাবে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন দেশবাসীকে সেই ইতিহাসই লেখা ছিল লিফলেটগুলোতে। 'গণতন্ত্রীপ্রেমী' যুবক-যুবতীরা ওই বৃদ্ধার হাত থেকে লিফলেটগুলো কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল। চোখের সামনে যেন সেদিন দেখতে পেলাম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের পেলেগেইয়া নিলভ্না চরিত্রটিকে। গণ্ডগোল দেখে পিঠ বাঁচাতে পালিয়ে এলাম আমি।

লক্ষ করিনি বৃদ্ধা কখন আমার পেছন পেছন চলে এসেছেন। আমার পাশাপাশি এসে বললেন 'আমরা লেনিনের পাশে না দাঁড়ালে কে দাঁড়াবে বলো? উনিই তো আমাদের সব। উনি আমাদের মানুষ হতে শিখিয়েছেন, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন। কী ছিল আমাদের জীবন বিপ্লবের আগে? সে তো পশুর জীবন। বুকের রক্ত জল করে দুবেলা দু-মুঠো অন্ন জোগাতে হত। আমার চৌদ্দপুরুষের কারও অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না। আমাদের ভাইবোনদের কারও মানুষ করার ক্ষমতা আমাদের মা-বাবার ছিল না। আমি বিপ্লবের প্রায় সমবয়সি। অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছি। শিক্ষার আলো পেয়েছি, জীবনে যা পাবার সে সবই পেয়েছি সোভিয়েত আমলে। ধাত্রীবিদ্যা ইনস্টিটিউটের পাঠ শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি। এসব কথা ভুলি কেমন করে? কী দিয়ে এই ঋণ শোধ করতে পারি?..।'

দুই

সোভিয়েতের শেষ নিশ্বাস

মস্কো, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১। গত মাসে দূরদর্শনের এক সম্প্রচারে ধনীদের সম্পর্কে আপনার মনোভাব কী— এই প্রশ্নের ভিত্তিতে জনমতের পরিচয় দেওয়া হয়। প্রশ্ন যাদের করা হয়েছিল সবরকম বয়সের লোকজন ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগেরই বেশভূষা ও চেহারার চাকচিক্য চোখে পড়ার মতো। জানা যায়, শতকরা পঁচাত্তর জনই ধনীদের প্রতি ভালো মনোভাব পোষণ করেন এবং যেন-তেন প্রকারেণ বড়োলোক হতে তাদের নিজেদেরও কোনো আপত্তি নেই। অথচ তার ঠিক কয়েক দিন আগেই শহরের কেন্দ্রস্থলে তথাকথিত কো-অপারেটিভ, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং ইয়ং মিলিয়িনিয়েরদের বিরুদ্ধে মহিলাদের যে-একটি বিক্ষোভ প্রকাশ্য সমাবেশ ঘটেছিল তার কোনো উল্লেখ ছিল না। দূরদর্শনে সেদিন এক কোটিপতি মহিলাকেও দেখানো হয়। একনজরে দেখেই বুঝতে বাকি থাকে না যে, ব্যাপারটি সাজানো। পরে Radio Liberty ফাঁস করে দেয় সেই রহস্য। কো-অপারেটিভের মালিক বলে যে সুন্দরী মহিলাকে দেখানো হয়েছিল, তার আসল মালিক। অন্য লোকজন— মহিলাকে রাখা হয়েছে তদন্তকারীদের মনোরঞ্জনের জন্য। ঝুঁকির জন্য তিনি বেতন পান।

কিন্তু তাতে স্থানীয় প্রচারমাধ্যমগুলির কিছু এসে যায় না। উঠতি বড়োলোকরা বিভিন্ন চ্যারিটি শো আর সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে অর্থ তুলে যেভাবে জনসেবা করছেন, তার পরিচয় তুলে ধরাতে তাদের ভাবমূর্তি জনসমক্ষে অবশ্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইয়ং মিলিয়নিয়েরদের ক্লাব আজকাল বেশ জনপ্রিয়। কোনো কোনো প্রাচীন ব্যক্তি এই আশাও প্রকাশ করেছেন যে, বড়োলোকদের জনকল্যাণমূলক কাজের দৌলতে তাঁদের দারিদ্র্য লাঘব হবে। রাজধানীতে পাইওনিয়ের ধরনের সংগঠনের জায়গায় উঠতি বয়সি ছেলে-মেয়েরা গড়ে তুলেছে Teenage Republic নামে এক অ্যাসোসিয়েশন— নামটা অবশ্যই ইংরেজিতে। Management শেখার জায়গা। শুরু করছে

খবরের কাগজ হকারি দিয়ে— পশ্চিমের অনেক বড়ো বড়ো লোকের জীবন তো ওই দিয়েই শুরু। সুন্দরী মেয়েদের সুবর্ণ সুযোগ— বিদেশি বড়োলোকদের বিয়ে করে বিদেশে Migrate করতে পারে— এই ধরনের বিয়ের ঘটকালির একটি এজেন্সি খোলা হয়েছে শহরে।

উলটো পুরাণের কী মহিমা! প্রথমত, সোভিয়েত আমলে কোনো পত্র-পত্রিকায় ঘটকালির কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয়ত, এও কি সোভিয়েত আমলের এক চরমপন্থার এক ধরনের প্রতিক্রিয়া? সোভিয়েত আমলে এধরনের বিয়ে ছিল Cosmopolitanism-এর নামান্তর, এই Cosmopolitanism সোভিয়েতের দর্শনের সঙ্গে খাপ খায় না। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যুগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম গোপেন চক্রবর্তীর নিজের মুখে শুনেছি স্তালিন আমলে তিনি সোভিয়েত দেশ থেকে যখন নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময়ে তাঁর রুশি স্ত্রীর ছবি পর্যন্ত তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। এও মনে আছে, সোভিয়েত আমলে, সম্ভবত ১৯৭৮ সালেই হবে, সেই সময়কার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'লিতেরাতুনরনায়া গাজেতা' (সাহিত্যপত্র)'-তে 'আমি তোমাদেরই' এই শিরোনামে বেশ কয়েকটি সংখ্যা ধরে সেই সব সোভিয়েত নারীর দুঃখদুর্দশার করুণ কাহিনি তাদের নিজেদের বয়ানে প্রকাশিত হতে থাকে যারা বিদেশিদের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে শেষকালে তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। বিশেষ করে মনে পড়ে ১৯৮১ সালে 'কম্‌সোমোল্‌স্কায়া প্রাভ্‌দা' পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায় প্রকাশিত দুটো চিঠির কথা। পত্রিকার কোনো এক পাঠিকা জনৈক বিদেশির প্রেমে পড়েছে, তাদের বিয়ে করা উচিত হবে কিনা এই বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে সে সম্পাদকের দপ্তরে একটি চিঠি লিখেছে। সম্পাদক মশাই এই সমস্যার সরাসরি কোনো সমাধান না দিয়ে এই চিঠিটার পাশাপাশি কাগজে ছাপিয়ে দিলেন আরেক জন মহিলার আর একটি করুণ চিঠি, যেখানে সেই মহিলা এক বিদেশিকে বিয়ে করার পর নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রেমের পাট চুকিয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। দুটো চিঠির দুই কলমের মাঝের শিরোনামে লেখা হয়েছিল: 'দুই পত্রের মুখোমুখি সাক্ষাৎ'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই ব্যাপারে আমার নিজেরও তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, আমিও ভুক্তভোগী, তবে সোভিয়েত জনসমাজের কাছ থেকে ততটা নয়, যতটা সরকারি আমলাদের মহল থেকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর হুকুমনামা বলে সোভিয়েত ও বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে বিবাহবন্ধন আইনত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

স্তালিনের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে, ১৯৫৩ সালের ২৪ অক্টোবর এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৫৪ সালের ২১ জানুয়ারি ঘোষিত রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ্‌ প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর হুকুমনামাবলে বিদেশি ও সোভিয়েত নাগরিকদের মধ্যে যেসমস্ত বিবাহ আইনত অসিদ্ধ ছিল সেগুলিকে রেজিস্ট্রি করার অনুমতি দেওয়া হয়।

সে যাই হোক, আগেকার আমলের মতো আজও পরামর্শ দেওয়ার লোকের কোনো অভাব নেই। অবশ্য সোভিয়েত আমলে তো এই নিয়ে একটা রসিকতাই প্রচলিত ছিল। রসিকতা এই যে, 'হাজার হোক আমাদের দেশ সোভিয়েত (আক্ষরিক অর্থে পরামর্শ, পরিষদ ইত্যাদি) দেশ!'—পরামর্শের দেশ। আজকাল দোকানে দামি জিনিস দেখে ক্রেতা অর্থাভাবের দোহাই পেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে মালিক মুচকি হেসে উপদেশ দেয় 'রোজগার করতে জানতে হয়।'

সহজে রোজগারের একটি পন্থা— ভিক্ষাবৃত্তি। ইদানীং রাস্তাঘাটে সে-দৃশ্য বিরল নয়। পাতাল রেলের সাবওয়েগুলিতে ভিখারির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সকলে যে পেটের দায়ে ভিক্ষা করছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। ত্‌ভের্‌স্কায়া স্ট্রিট (এককালের গোর্কি স্ট্রিট) দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একজন দাঁড়িয়ে আছে সামনে একটা কাগজে-লেখা-আবেদন পেতে— ইংরেজিতে লেখা—সপরিবারে মার্কিন মুলুকে migrate করতে চাই— সাহায্যপ্রার্থী। অদ্ভুত আবদার!

এরই মধ্যে এক জায়গায় এক মহিলাকে খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুন্দর গলাটা। সাধে কী আর একশ্রেণির লোক এমন কথাও বলছে যে, মেত্রোর সাবওয়েগুলিতে নাচ-গান-বাজনার কল্যাণে আজকাল মেত্রো যাতায়াত করাটা বড়ো আনন্দের আর বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে।

মনে পড়ে গেল বছর দেড়েক আগে কোনো এক উৎসব উপলক্ষ্যে আমারই পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে একটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়। স্বামী-স্ত্রী— বয়স ৩০-৩৫-এর মধ্যে। এক ছেলে বয়স পাঁচ, আর এক মেয়ে বছর সাতেক বয়স। গান-বাজনায় ওরা সকলেই বেশ ওস্তাদ। সেদিন আসর মাতিয়ে তুলেছিল। স্বামী সরকারি আইনজীবী, স্ত্রী-ও সরকারি কর্মচারী। বেশ ভালো লেগেছিল। সেদিন শুনলাম স্বামী ভদ্রলোকটি নাকি 'ধূত্তোর' বলে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন— বড়ো অল্প মাইনে। এখন সপরিবারে সপ্তাহে দিন চারেক সন্ধ্যা বেলায় শহরে চলে যান।— রাস্তার ধারে ভালো একটা জায়গা বেছে নিয়ে গানের আসর বসিয়ে দেন। সপ্তাহে রোজগার ৫০০

রুবল। কেমন সহজে ভালো রোজগার! অনেক সময় বাবা-মা সন্ধ্যায় না বের হলে মেয়েই মনে করিয়ে দেয়। টাকা রোজগারে তারও উৎসাহ কম নয়। VCR কেনার যে স্বপ্ন তাদের ছিল, এইভাবে আর কিছুদিন চললে তা সফল হবে। মহিলার প্রথম প্রথম লজ্জা হত। এখন আর কোনো সংকোচ বোধ করেন না। কিন্তু এভাবে অর্থ উপার্জন? কৈফিয়ত— কেন? শ্রমের বিনিময়েই তো অর্থ উপার্জন করছি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা— টাকা টাকাই, টাকায় কোনো গন্ধ লেগে থাকে না।

এখানে ১৯৯৪ সালের ১৬ জানুয়ারির 'কম্‌সোমোল প্রাভ্‌দা' পত্রিকায় 'একান্তই ব্যক্তিগত' কলামে কোনো এক ভদ্রমহিলার একটি ক্ষুদ্র প্রতিবেদনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

> "১৯৪২ সাল দোন্‌-এর রস্তোভ্‌। বাজার চত্বরে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। অল্পবয়সি মেয়ে ও বর্ষীয়সী মহিলাদের নিয়ে সংখ্যায় কয়েক-শো হবে। জার্মানরা এবং তাদের পুলিশবাহিনী আমাদের সকলকে ধরে মালগাড়ির ওয়াগনে গাদাগাদি করে তুলে দিয়ে ঘটাং করে দরজা বন্ধ করে দিল। গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। গাড়ি করে আমাদের চালান করে দেওয়া হবে, কোথায়? আমরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে বলাবলি করতে লাগলাম: জার্মানিতে।
>
> "দু-দিন পরে খালাস করা হল। ভিনদেশি লাল আকাশ, খেলনার মতো ছোট্ট শহর, লাল টালি ছাওয়া ছোটো বাড়িঘর। আমাদের ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।
> ...
>
> ১৯৪৪ সালের হেমন্তকাল। বিমানহানা শুরু হয়ে গেছে। তারই মধ্যে আমাদের মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল, মনিবদের ক্ষেতের শালগম তুলতে হবে।... একদিন কাজের পর বুড়ো মনিব আমাদের তিন জনকে একটা কাজে তার বাড়িতে ডেকে পাঠাল। বসার ঘরে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো। আমি এগিয়ে গিয়ে ডালা তুললাম... মুহূর্তের মধ্যে কী হল... আমি সামনের চেয়ারে বসে পড়ে চড়া পর্দার একটা বাজনা ধরলাম। কাশ ফুলের মতো মাথায় একরাশ সাদা চুল এই বুড়ো মানুষটা কী করে জানবে এই 'রুশি শুয়োরটা' সংগীত বিদ্যালয় শেষ করেছে এবং তার স্বামী রাশিয়ায় একজন সুরকার।
>
> "বেঠোফেন মোৎসার্ট, রাখ্‌মানিনভ্‌ এবং বলাই বাহুল্য চাইকোভ্‌স্কি... রাশিয়া... রুশ গীতি... বুড়ো কোনো কথা না বলে ধপাস করে সোফায় গা এলিয়ে, দিল, চোখের চশমা কোথাও খসে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেল। মাত্র গতকালই সে খবর পেয়েছে রাশিয়ার কোনো এক শহরে... মিন্‌স্কে না কোথায় যেন তার ছেলে ওয়াল্‌টার যুদ্ধে মারা গেছে। এই পিয়ানো সে বাজাত।
>
> "আমি আমার জীবন পার করে এসেছি।...আমার বয়স চুরাশি। নিঃশব্দে হেঁটে চলেছি পাতাল রেলের সাবওয়ে দিয়ে। জীবনটা কেমন যেন দুর্বোধ্য, ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, কেমন যেন অর্থহীন মনে হয় এখন।
>
> "...কিন্তু কী আশ্চর্য। পাভেলেৎস্কির কাছাকাছি আসতে দেখি একটা জায়গায় একটা বাচ্চা ছেলে বাঁশিতে মোৎসার্ত বাজাচ্ছে। আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, আমার চোখে জল এসে গেল। পেনশনের টাকা থেকে পাঁচ রুবলের একটা নোট বার করে তার সামনে পেতে রাখা টুপিতে ফেলে দিলাম। সে মাথা নুইয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাল, তারপর বাজাতে শুরু করল শুবের্তের 'Ave Maria'। না। সংগীতের মৃত্যু নেই, যতক্ষণ সংগীত আছে ততক্ষণ জীবন আছে, জগৎও আছে। আমার থাকার মধ্যে আছে এই সংগীত, আমার হৃদয়ের স্মৃতিসুধা।... জীবনের কয়েকটা তাল আর লয়।"

অযোধ্যা রায়— অসাংবিধানিক

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

রাম পুরাণের চরিত্র না ঐতিহাসিক চরিত্র এ নিয়ে বিতর্ক না থামলেও রাম মন্দির তৈরির বিতর্ক আপাতত থামল। সৌজন্যে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়।

সুপ্রিম কোর্টের ৯ নভেম্বর ২০১৯ রায়ে বলা হল বিতর্কিত জমি অর্থাৎ যেখানে বাবরি মসজিদ ছিল, সেইখানেই রাম মন্দির তৈরি করার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়কে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫ একর জমি দেওয়া হবে। এবং দুটি কাজই দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিলেন সংবিধানের ১৪২ ধারা প্রয়োগ করে।

ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে (Preamble) তিন রকম ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে। আর্থিক ন্যায়, সামাজিক ন্যায় ও রাজনৈতিক ন্যায়।

১৪২ ধারায় সুপ্রিম কোর্টকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিচারাধীন কোনো বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি ন্যায় (complete justice) দেবার জন্য যেকোনো আদেশ দেবার।

এই ন্যায় দেবার ক্ষমতা অবশ্যই মুখবন্ধে নির্ধারিত সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক ন্যায় সম্পর্কিত। যেমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, শ্রমিক কর্মচারীদের মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচার্য তখন সুপ্রিম কোর্ট আইনি সূক্ষ্মতার মধ্যে না গিয়ে একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেন, ইত্যাদি। কিন্তু সংবিধানের মূল চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী একটি অবস্থান নিতে গিয়ে সংবিধানের বিশেষ ধারার প্রয়োগ, সংবিধানের অমান্যতা।

বাবরের রাজত্বকালে অযোধ্যায় একটি মসজিদ তৈরি করা হয়। বাবরি মসজিদ। সে মসজিদটি ৫০০ বছর ধরে টিকে ছিল। ধর্মের কথা বাদ দিলেও নিঃসন্দেহে একটি স্থাপত্যকাণ্ডের নিদর্শন। ভারতীয় শ্রমিকেরাই ওটি নির্মাণ করেছিলেন। সেই শ্রমিকদের ধর্ম পরিচয় কারো জানা নেই। হিন্দু মৌলবাদীদের ধারণা যেখানে মসজিদ তৈরি হয়েছে সেখানেই নাকি রাম জন্মেছিলেন। রাম কবে জন্মেছিলেন তা কেউ জানে না। বিশ্বাসীদের মতে হাজার হাজার বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন। তার কোনো সমসাময়িক নথিপত্র নেই।

রামের জন্মস্থানে যখন মসজিদ তৈরি হয়েছিল তখনও নিশ্চয় হিন্দুধর্মের অনুগামীরা ছিলেন তারা কি কোনো প্রতিবাদ বা বাধা দিয়েছিলেন? এমন কোনো সুদূর তথ্যও নেই। ১৬ শতকে মসজিদ তৈরির পর কখনোই কোনো প্রতিবাদের নিদর্শনও নেই। ছিল না কোনো রামের পূজা। বিরোধ তৈরি হল ইংরেজ শাসনকালে।

সুপ্রিম কোর্ট কী বলছে দেখা যাক। রায়ের 786(iv) প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে,

'The communal riots that took date in 1856-7 resulted in the colonial administration setting up a grill-brick wall to bring about a measure of peace between the conflicting claims of the two communities. The immediate aftermath of the railing led to the dispute over the Ramchabutra, which was erected right outside the railing and from where the Hindus sought to offer worship to Lord Ram. The time of the setting up of the Chabutra, the place of its location and the offer of worship to Lord Ram on Chabutra are pointers in the direction of the Hindu continuing to offer worship immediately outside the railing when faced with a possible exclusion from the inner courtyard;

The construction of the grill-brick wall during the colonial administration did not constitute any determination of title as between the Hindu and the Muslims but was a measure intended to maintain public peace and safety having regard to the incidents which had taken place in 1856-7 resulting in a loss of life;

That the setting up of a buffer in the form of the grill-brick wall did not amount to an absolute exclusion appears from sporadic incidents such as

the incident involving the setting up of a flag and the performance of hawan and puja by the Nihang Singh within the precincts of the mosque.

In 1934, there was yet another communal riot during the course of which the domed structure of the mosque was damaged. This led to the imposition of a fine on the Hindu residents of Ayodhya and the work of restoration being carried out at the expense of the colonial administration through a Muslim contractor. This indicates that while the Hindus had continued to offer worship continuously in the outer courtyard, there was no abandonment of the claim by the Muslims of the status of the structure inside the inner courtyard as a mosque. After 1934, there is documentary material to indicate that arrangements were made for the appointment of a Pesh Imam and Mutuwalli for the mosque which would belie the notion that there was an abandonment of the mosque;

After 1934, evidence indicates that Muslim worship in the form of namaz had reduced as a result of the obstructions in their access to the inner courtyard. By 16 December 1949 (the last Friday namaz) the mosque was being used for the purpose of Friday namaz. The circumstances bearing upon the restoration of the damage which was done to the mosque in 1934, availing of the services of the Pesh Imam and the offering of namaz albeit to a reduced extent are circumstances which point to a reasonable inference that there was no total ouster of the Muslims from the inner structure prior to 22/23 December 1949 though their access was intermittent and interrupted; and

On 22/23 December, 1949, idols were installed below the central dome of the inner structure which, according to the Muslims, led to the desecration of the mosque. Prior to this, the last namaz was offered on Friday, 16 December, 1949. The Friday namaz due on 23 December 1949 could not be offered due to the intervening desecration of the mosque.'

তাহলে দেখা গেল মসজিদের ভিতরে জোর করে ঢুকে পূজা করার চেষ্টা হিন্দুরা করছে ব্রিটিশ শাসকদের আমলে। বরং বলা ভালো ব্রিটিশদের মদতে। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে রাখা সাম্রাজ্যবাদীদের চিরায়ত কৌশল।

হিন্দুত্ববাদীরা প্রায়শই বলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে নাকি মাটির তলায় মন্দির পাওয়া গিয়েছে। এই দাবিটাও মতামত তৈরি করার একটা অপকৌশল। দেখা যাক সুপ্রিম কোর্ট কী বলছে।

'The Conclusion...

The reason for the destruction of the pre-existing structure; and;

Whether the earlier structure was demolished for the purpose of the construction of the mosque.

Since the ASI report dates the underlying structure to the twelfth century, there is a time gap of about four centuries between the date of the under lying structure and the construction of the mosque.

No evidence is available to explain what transpired in the course of the intervening period of nearly four centuries.

The ASI report does not conclude that the remnants of the preexisting structure were used for the purpose of the construction the mosque (apart, that, is from the construction of the mosque on the foundation of the erstwhile structure); and

The pillars that were used in the construction of the mosque were black Kasauti stone pillars. ASI has found no evidence to show that these Kasauti Pillars are relatable to the underlying pillar bases found during the course of excavation in the structure below the mosque.

A finding of title cannot be based in law on the archaeological findings which have been arrived at by ASI. Between the twelfth century to which the underlying structure is dated and the construction of the mosque in the sixteenth century, there is an intervening period of four centuries. No evidence has been placed on the record in relation to the course of human history between the twelfth and sixteen centuries. No evidence is available in the case of this antiquity on (i) the Cause of destruction of the underlying structure; and (ii) whether the pre-existing structure was demolished for the construction of the mosque. Title to the land must be decided on settle legal principles and applying evidentiary standards which govern a civil trial.'

এতদসত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টের মতে, সম্ভাব্য সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে (preponderance of probabilities) ভিত্তিতে হিন্দুদের দাবিটাই মেনে নিতে হবে। যেহেতু, সেই ইংরেজ আমল থেকেই জোর করে মসজিদ দখল নেবার চেষ্টা হয়েছে এবং পূজা করা হয়েছে ও রামলালার মূর্তি রেখে দেওয়া হয়েছে, অতএব ওইটি হিন্দুদের প্রাপ্য। এটা ন্যায় বিচার নয়। বিচারকদের গোপন ইচ্ছার প্রকাশ।

On the balance of probabilities, there is clear evidence to indicate that the worship by the Hindus in the outer courtyard continued unimpeded in spite of the setting up of a grill – brick wall in 1857. Their possession of the outer courtyard stands established together with the incidents attaching to their control over it.

As regard the inner courtyard, there is evidence on a preponderance of probabilities to established worship by the Hindu prior to annexation of Oudh by the British in 1987. The Muslims have offered no evidence to indicate that they were in exclusive possession of the inner structure prior to 1857 since the date of the construction in the sixteenth century. After the setting up of the grill-brick wall, the structure of the mosque continued to exist and there is evidence to indicate that namaz was offered within is precincts. The report of the Wakf inspector of December 1949 indicates that Muslims were being obstructed in free and unimpeded access to mosque for the purpose of offering namaz. However, there is evidence to show that namaz was offered in the structure of the mosque and the last Friday namaz was on 16th December, 1949. The exclusion of the Muslims from worship and possession took place on the intervening night between 22/23 December, 1949 when the mosque was desecrated by the installation of Hindu idols. The ouster of the Muslims on that occasion was not through any lawful authority but through an act which was calculated to deprive them of their place of worship. After the proceedings under Section 145 of Cr.P.C. 1898 were initiated and a receiver was appointed following the attachment of the inner courtyard, worship of the Hindu idols was permitted. During the pendency of the suits, the entire structure of the mosque was brought down in a calculated act of destroying a place of public worship. The Muslims have been wrongly deprived of a mosque which had been constructed well over 450 years ago.

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, বাবরি মসজিদ ভাঙাটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁরা এটাও বলেছেন অপরাধীদের কড়া সাজা হওয়া উচিত। তবে, হিন্দুদের পূজার অধিকার তাকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না।

অতএব ১৪২ ধারা প্রয়োগ করে সরকারকে দিয়ে মন্দির বানাও। হিন্দুত্ববাদীদের স্লোগান— মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে কার্যকরী কর। মুসলমানদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ একর জমি দিতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের মনে রাখা উচিত ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সরকার কখনো মন্দির, মসজিদ নির্মাণে লিপ্ত হতে পারে না। এই রায় প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে ও মৌলবাদীদের পক্ষে।

মৌলবাদীরা উৎসাহিত হলে তারা তাদের অপকর্মের জন্য পুরস্কৃত হল। তারা আবারও একই কায়দায় বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান দখল নেবে ও ধ্বংস করবে। সুপ্রিম কোর্টের সম্ভাবনার সম্ভাব্যতা (preponderance of probabilities) তত্ত্বে তাদের দখল দাবি করবে।

ভারতের অখণ্ডতা ও বিভিন্নতার বৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখতে গেলে প্রবলভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির পক্ষে দাঁড়াতে হবে। এই রায়ের তীব্র সমালোচনা করতে হবে। এই অন্যায্য রায় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার মূল তত্ত্বকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেবে।

জেএনইউ ছাত্রবিক্ষোভের নেপথ্যে

তেজস্বী রায়

আপনি যেহেতু ট্যাক্স দেন, সুতরাং সেই ট্যাক্সের টাকা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা জানার অধিকার অবশ্যই আপনার আছে। দেশের তথা জনগণের মঙ্গলার্থে যেকোনো কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সরকার সেই সংগৃহীত অর্থকে উপযুক্ত খাতে বণ্টন ও বিনিয়োগ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। বিনিয়োগের সেই খাতগুলি মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক। সামাজিক খাতের ব্যয়গুলির মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ এই ক্ষেত্রগুলির উপর ভিত্তি করে মানব সম্পদের স্বক্ষমতার (capability) বিকাশ সাধন হয়ে থাকে— এ সম্পর্কে কোনো গবেষণা, শিক্ষাবিদ বা অর্থনীতিবিদ ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং, শিক্ষার গুরুত্ব কতটা তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমেই অধিকাংশ দেশ উন্নতি লাভ করেছে এবং মানব সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ, আমাদের দেশে এই ক্ষেত্রগুলি আজও প্রাধান্য পায় না।

এবারে আসা যাক জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। জেএনইউ-এর ছাত্ররা আবার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল কেন? যখন ফাইনাল পরীক্ষা অর্থাৎ এন্ড সেমেস্টার এক্সাম দোরগোড়ায়, তখনও এত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী সংঘবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামল কেন? এ সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে, ২৮শে অক্টোবরে পাস হওয়া ছাত্রাবাসের সংশোধিত নির্দেশিকা/ নিয়মাবলী বা Revised IHA/Hostel Manual। ছাত্রছাত্রীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে এবং তাদের সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ ছাড়াই আইএইচএ (Inter Hall Administration) অনৈতিক ও একতরফাভাবে রিভাইসড হোস্টেল ম্যানুয়াল পাস করান। কী ছিল সেই ম্যানুয়ালে যার জন্য এত উত্তেজনা? ব্যাপারটা অবশ্যই বোঝা দরকার।

যদি মেস বিল বাদে সমস্ত খরচ মেলানো হয়, তাহলে, বিপিএল, সিঙ্গেল সীটার (একটি বেড যুক্ত রুম) এবং বিপিএলহীন সিঙ্গেল সীটার-এর বাৎসরিক ফিস পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে যথাক্রমে ৬৪০% (২,৭৪০ টাকা থেকে ১৯,৩০০ টাকা) এবং ১২১৮% (২,৭৪০ টাকা থেকে ৩৬,১০০ টাকা)। অন্যদিকে বিপিএল এবং নন-বিপিএল ডবল সীটারের (দুটি বেড যুক্ত রুম) ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ৫৬৮% (২,৬২০ টাকা থেকে ১৭,৫০০ টাকা) এবং ১১৪০% (২,৬২০ টাকা থেকে ৩২,৫০০ টাকা)। এ সমস্ত ফি-এর সাথে যোগ হবে মেস বিল যা সাধারণত ২,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা প্রতি মাসে হয় (যা ঋতু, বাজারদর, খাওয়াদাওয়ার মেনু, পরিমাণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে কম বেশি হয়)। যদি গড়ে ২,৫০০ টাকা মাসে ধরা হয়, তাহলে তা বছরে দাঁড়ায় ৩০,০০০ হাজার টাকায় যা বিপিএল ও নন-বিপিএল উভয়ের ক্ষেত্রে যোগ হবে।

এখন আসা যাক বিপিএল-এর ৫০% ছাড়-এর কথায় যা একটি অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। যার নিরিখে প্রশাসন ও সাধারণ জনগণ আন্দোলনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। তারা যে কীভাবে মূল সমস্যাকে ভুলভাবে পরিবেশিত করছে তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমাদের দেশের, দারিদ্র নিরূপণকারী বিভিন্ন কমিটির দেওয়া মানদণ্ড অনেক সময় হাসির খোরাক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কারণ সেই মানদণ্ড গ্রহণ করলে এপিএল শ্রেণিতে থেকেও (দারিদ্র্য সীমার ঊর্ধ্বে যারা) অনেক পরিবার সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে না। কারণটা সহজেই অনুমেয়— ভারত সরকার (প্ল্যানিং কমিশন) দারিদ্র্য সীমারেখাকে পরিবারপিছু বার্ষিক আয় ১৭,০০০ টাকায় তথা মাসিক ২,২৫০ টাকায় রেখেছে। সুতরাং, তারা যদি ৫০% ছাড়ও পান, তবুও কি পড়াতে পারবেন জেএনইউ এর মতো এক প্রিমিয়ার ইউনিভারসিটিতে?

সুতরাং, বিপিএল-এর নামে 'ছাড়'— চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিচ্ছু না। বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় বিপিএল ভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিতান্তই কম বিশেষত এমফিল এবং পিএইচডি-তে। গোটা ক্যাম্পাসে অনুসন্ধান করলে হাতে গোনা কিছু বিপিএল কার্ডধারী ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যাবে মাত্র; কারণ তাদের বেশিরভাগ উচ্চশিক্ষায় পৌঁছনোর আগেই আর্থিক ও

পারিবারিক চাপে পড়াশোনা মাঝপথেই বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। উপরন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন এবং রেশন ডিলার সহচররা সেই কার্ড সহজে হস্তগত করেন।

এখানে বলা বাহুল্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের দেওয়া প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে, ৪০% ছাত্রছাত্রীর পারিবারিক আয় মাসিক ১২,০০০ টাকা অর্থাৎ বার্ষিক ১,৪৪,০০০ টাকা (সূচি ১ দেখুন)— এদের বেশিরভাগই বিপিএল-এর আওতায় আসে না। এটা বোঝা খুব কঠিন নয় যে, বিপিএল-দের 'ছাড়'-এর নাম করে একটা বড়ো অংশের আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং প্ল্যান মাফিক সেই ক্যাটাগরির ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সহজ গণিত কষলেই এটা সহজেই বোধগম্য হবে যে প্রান্তীয় মানুষজন তাদের সন্তানদের খরচ চালাতে পারবেন না। যেখানে সেই স্বল্প আয়ে পরিবার চালাতে হিমসিম খেতে হয়, সেইখানে তারা কি তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করাতে পারবেন? তাদের কি অধিকার নেই উচ্চশিক্ষার বা ভালো ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখার বা দিল্লিতে পড়াশোনা করার? জেএনইউ-এর মতো একটি প্রতিষ্ঠান যা সেই আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ ছাত্রছাত্রীর আশ্রয়স্থল— যার ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র অনেক বেশি দরিদ্রপ্রেমী, যেখানে সমাজের সব অংশের মানুষ নির্দ্বিধায় এসে পড়াশোনা করতে পারেন।

সারণি ১ : কারা পড়ে জেএনইউতে?

বার্ষিক প্রতিবেদন/বছর	মাসিক পারিবারিক আয় (টাকায়)		অঞ্চল	
	১২০০০ টাকার কম	১২০০০ টাকার বেশি	গ্রাম	শহর
৪৩ তম/২০১২-১৩	৪৭.৭৭%	৫২.২৩%	৩৫.৭৮%	৬৪.২২%
৪৪ তম/২০১৩-১৪	৪৫.৬৭%	৫৪.৩৩%	৪০.৯৮%	৫৯.০২%
৪৫ তম/২০১৪-১৫	৪২.৬৫%	৫৭.৩৫%	৪১.৯৯%	৫৮.০১%
৪৬ তম/২০১৫-১৬	৩৯.১০%	৫২.৩৪%	৩৪.৯৮%	৪৬.০২%
৪৭ তম/২০১৬-১৭	৪৩.১১%	৫৬.৫৭%	৪৪.০৭%	৫৫.৮৪%
৪৮ তম/২০১৭-১৮	৪০.০৪%	৫৮.১০%	৪৩.৯৬%	৫৬.০৪%
উৎস : জেএনইউ রিপোর্টস				

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী কার্যনির্বাহী সমিতির মিটিং বরাবরই ক্যাম্পাসে হয়ে আসছে। অথচ, নভেম্বর ২০১৯-এর মিটিং সমস্ত নিয়ম ভেঙে এক দূরবর্তী স্থানে অনুষ্ঠিত হয়, যাতে ছাত্র সংসদ তাদের দাবি তুলতে পারে না। উপরন্তু অনেক সদস্যের অনুপস্থিতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেখানেই বিপিএল-এর জন্যও ৫০% ছাড় ঘোষণা করা হয়েছিল যাকে তারা 'মেজর রোল-ব্যাক' নামে অভিহিত করেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উঠছে। শুধু বিপিএল-ই কেন, পিছিয়ে থাকা এসসি, এসটি এবং ওবিসি-রা কেন এই তথাকথিত ছাড় পাবে না? হোস্টেল বন্টনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে— যা আগে ছিল। একইভাবে প্রতিবন্ধীদের যেখানে আগে হস্টেল পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হত, তাও নতুন ব্যবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অনেকেই আশঙ্কা করেছেন যে, এই নতুন ম্যানুয়াল লাগু হলে জেএনইউ-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো এক লহমায় বদলে যাবে। কী সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি? এটিই সম্ভবত দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ছাত্রদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে লাগু করা হয়। তদুপরি, সমাজের অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির মানুষ যেমন প্রান্তিক জেলার অধিবাসী, মহিলা, প্রতিবন্ধীরা যাতে সহজে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতে পারেন তার জন্য নানান বিধান তৈরি করা হয়। যেমন প্রান্তিক জেলার ছাত্র-ছাত্রী হলে বা মহিলা হওয়ার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় অতিরিক্ত নম্বর (deprivation point) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাদের শুধু অ্যাডমিশনই সুনিশ্চিত করে না, এমন এক পরিসর প্রদান করে, যেখানে তারা তাদের স্বক্ষমতা ও স্বকীয়তার বিকাশ ঘটায় ও দেশের উন্নয়নে যোগদান করে। আজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই সমস্ত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।

জেএনইউ সস্তায় আন্তর্জাতিক স্তরের উচ্চশিক্ষা প্রদান করে। কিন্তু সেখানে প্রশাসনের ফি-বৃদ্ধির প্রস্তাব মেনে নিলে,

জেএনইউ-এর ফি ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বাধিক হতে চলেছে। দ্য প্রিন্ট সংবাদমাধ্যম এই হিসেব জনগণের সামনে তুলে এনেছে যা সারণি ২-এ দেওয়া হল।

সারণি ২ : বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি কাঠামো

বিশ্ববিদ্যালয়	বার্ষিক ফি + মেস ফি (টাকায়)	বিশ্ববিদ্যালয়	বার্ষিক ফি + মেস ফি (টাকায়)
জেএনইউ	২৭,৬০০-৩২,০০০ (পূর্ব); ৫৫,০০০-৬১০০০ (বর্তমান)	বিএইচউ	২৭,৪০০ (গড়ে)
		গুরু ঘাসিদাস	২২,০০০-২৫,২০০
দিল্লি	৪০,০০০-৫৫,০০০ (গড়ে)	পণ্ডিচেরী	১২,০০০-১৫,২০০
জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া	৩৫,০০০	আলীগড়	১৪,৪০০
বিশ্বভারতী	২১,৬০০-৩০,৪০০	হায়দরাবাদ	১৪,০০০ (গড়ে)
এলাহাবাদ	২৮,৫০০		
Source : The Print, Dated 14th Nov, 2019			

আর প্রতিবাদের কারণ শুধু হোস্টেল ফি বৃদ্ধিই নয়, একই সঙ্গে এর সাথে আরও বলা হয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা ১১ টার মধ্যে বা লাইব্রেরি বন্ধ হওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যে হোস্টেলে ফেরত আসতে হবে, না হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসন ইতিমধ্যে লাইব্রেরির বেশ কয়েকটি রিডিং রুম বন্ধ করে দিয়েছে যেগুলো একসময় ২৪x৭ ঘণ্টা খোলা ছিল। এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, আগামী দিনে হোস্টেল এক প্রবেশের টাইমিংকে লাগু করার জন্যও সমস্ত লাইব্রেরি রাত ১২ টায় বন্ধ করা হবে। অথচ দেশের ও বিদেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিগুলি বিরতিহীনভাবে খোলা থাকে। অথচ, জেএনইউ প্রশাসনের মতে, রাত্রে ছাত্রছাত্রীদের বাইরে বেরতে দেওয়া হলে, তারা অনৈতিক কাজে যুক্ত হতে পারে। এটা নিছকই ভুল ধারণা। সমগ্র দিল্লি মহানগরী তথা দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম নিরাপদ স্থল হিসেবে জেএনইউ-কে গণ্য করা হয়। ২০১২ সালের অ্যাডমিশন নেওয়ার পর কোনোদিন দেখিনি এখানে র‍্যাগিং হয়েছে বা সিনিয়ার জুনিয়ার এর ওপর অত্যাচার করছে বরং অনুভব করেছি নানা ভাষা, নানা মত ও নানাবিধ সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে জন্ম দিয়েছে এক 'মিনি ইন্ডিয়ার'। এখানকার ধাবাগুলোতে, দেওয়ালে, ছাত্রছাত্রীরা চা-এর আড্ডায় 'ক্রিটিকাল থিঙ্কিং'-এর বিকাশ ঘটায়। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার ফাঁকে বিতর্ক করে, আলোচনা করে, ভিন্নমত প্রকাশ করে। দেশে, সমাজে, রাজনীতিতে কী চলছে আর কী হওয়া উচিত— তার আলোচনা হয়। কিন্তু নতুন হোস্টেল ম্যানুয়াল সেই পরিবেশটি ধ্বংস করবে বলে আশঙ্কা।

আজ যে পরিস্থিতিতে আন্দোলনের ঝড় উঠছে, তা শুধু জেএনইউ আন্দোলন নয়, বরং এর এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রয়েছে— শিক্ষার বাণিজ্যিকিকরণ— যা বিশ্বের নানা প্রান্তে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। আজ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক গোষ্ঠীরা শিক্ষাকে এক বিনিয়োগের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে দেখছে। ফলস্বরূপ শিক্ষানীতিতে ব্যাপক রদবদল— যাতে শিক্ষাকে নিছক বাণিজ্যের উপাদানে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ, শিক্ষা বিক্রি হবে আর যার কেনার ক্ষমতা থাকবে সেই শুধু শিক্ষালাভ করবে। তাহলে প্রশ্ন হল, দেশের পেছনের সারির লোকদের কী হবে? বেসরকারি সংস্থাগুলো কি তাদের বাণিজ্যিক ক্ষতি করে এই লোকগুলোর কথা ভাববে? না; কারণ, অভিজ্ঞতা বলে, কোম্পানিগুলি মুনাফা বাড়াতেই বেশ ব্যস্ত থাকে। ভারত সরকারের প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষা নীতিতে (Draft New Education Policy) এমনই এক রাস্তা তৈরি হতে যাচ্ছে— যা এফডিআই তথা বেসরকারিকরণের পথকে প্রশস্ত করবে, যেখানে সামাজিক ন্যায়ের মূল্য নেই।

এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই অনেকেই প্রশ্ন করেন, কেউ যদি পিছিয়ে থেকে যান, গরিব থেকে যান বা 'কারও যদি নিজেকে গরিব মনে হয়' সেক্ষেত্রে সরকার তাদের দায়িত্ব কেন নিতে যাবে? তাদেরকে আমি শুধরে দিই। যে দেশ হাঙ্গার ইনডেক্স-এ প্রথম সারির দেশগুলোর একটি, যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে ব্যাংকে ধোঁকা দিয়ে এয়ারপোর্টের অভেদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেদ করে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ভিন দেশে কিছু লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে বা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাড লোনে আটকে আছে— সে সম্পর্কে আপনি কতটা চিন্তিত? আপনার মন ও বিবেকে আওয়াজ ওঠে বা প্রশ্ন জাগে না, যে সরকার আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 'সবকা সাথ,

সবকা বিকাশ, সবকা বিসওয়াস' তার কী হল? এই মৌলিক প্রশ্নগুলো আপনাকেও ওঠাতে হবে যদি আপনি একজন দায়িত্ববান নাগরিক হন।

শিক্ষা এমন একটি ধারাল অস্ত্র যা দিয়ে শোষণ, কুশাসন ও দারিদ্র্য দূর করা যেতে পারে। অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন শিক্ষাকে মানব সম্পদের ক্ষমতা বিকাশের তথা উন্নয়নের শর্ত হিসেবে দেখেছেন। অথচ, নতুন হোস্টেল ম্যানুয়াল হল এমনই একটি পরিকল্পিত পন্থা যা দিয়ে হাতেগোনা কতিপয় ক্ষমতাশীল উচ্চজাতি ও উচ্চশ্রেণির লোক উচ্চশিক্ষাকে শুধু তাদের হাতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। জেএনইউ-এর আন্দোলন শিক্ষাকে গরিব, বঞ্চিত মানুষের থেকে কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় ধনীদের কুক্ষিগত করার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার। জেএনইউ আন্দোলন কি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর? —এর বিচার ও বিবেচনার দায়িত্বও কিন্তু আপনার।

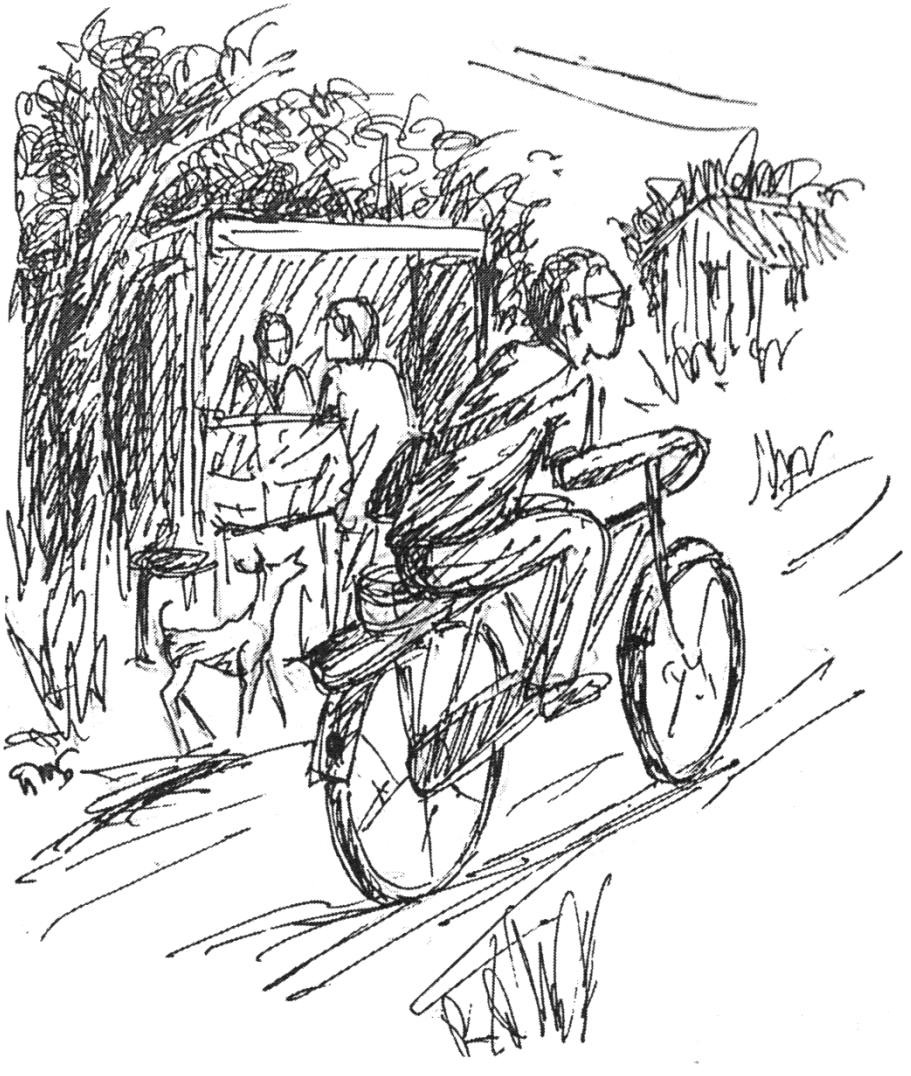

কচভাইদের নিয়ে কিঞ্চিৎ কচকচানি

অমিতাভ রায়

ডেভিড কচ প্রয়াত। অগস্টের শেষ সপ্তাহে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ছোটো করে হলেও খবরটি ছাপা হয়েছে। আমেরিকা-ইউরোপে তো প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম। এরকম অনেক মৃত্যু সংবাদ তো প্রতিদিনই প্রচারিত হয়। হঠাৎ করে ডেভিড কচ-এর মারা যাওয়ার পর এত চিন্তার কী হল?

ডেভিড কচ তো আর আমজনতা নন। তাঁর প্রয়াণের পরে মার্কিন অর্থনীতির পরিকাঠামোয় রীতিমতো ঝাঁকুনি লাগতে পারে বলেই খবরটি গুরুত্বপূর্ণ। কচ সাম্রাজ্যের অন্যতম শরিকের প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন মুলুকের তো বটেই সারা বিশ্বের কর্পোরেটের ব্যবস্থা বিষণ্ণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠীর নাম, কচ ইন্ডাস্ট্রিস। এই শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন কোন পণ্য উৎপাদন করে? অথবা বলা ভালো, কোন কোন পণ্য উৎপাদন করে না। এককথায় বলা যায়, সমাজ-সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত পণ্য ও পরিষেবা ব্যবস্থার সঙ্গে কচ ইন্ডাস্ট্রিস যুক্ত। একটা ছোট্ট তালিকায় চোখ বোলালেই কচ ইন্ডাস্ট্রিসের ব্যাপ্তির আন্দাজ পাওয়া যায়। রাসায়নিক পদার্থ, বিদ্যুৎ, সার, খনিজ, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, কাগজের মণ্ড ও কাগজ ইত্যাদি। অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার জন্য যে সব প্রাথমিক উপকরণ প্রয়োজন তার উৎপাদন ও পরিষেবার সঙ্গে কচ ইন্ডাস্ট্রিস যুক্ত। এছাড়া কচ ইন্ডাস্ট্রিস আর্থিক পরিষেবা এবং পণ্য বেচা-কেনা ব্যবসায় নিযুক্ত। সর্বোপরি নিজেদের রাঞ্চ সম্প্রসারণ করতে গিয়ে কচ ইন্ডাস্ট্রিস যেভাবে নৃশংসভাবে প্রকৃতির নিধন করে চলেছে তা নিয়ে পরিবেশবিদরা সমালোচনায় সোচ্চার। গবাদিপশুর বিচরণক্ষেত্র অর্থাৎ রাঞ্চ তৈরি করার জন্য সাধারণত পতিত জমিতে ঘাস-গুল্ম জাতীয় পশুখাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। কচ ইন্ডাস্ট্রিস অবিশ্যি শুধু পতিত জমিতে সন্তুষ্ট নয়। অরণ্য-পর্বতের চরিত্রে পরিবর্তন এনে রাঞ্চ বানানোর কাজ চলছে।

পৃথিবীর ৬০টি দেশে কচ ইন্ডাস্ট্রিসের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রায় সওয়া লক্ষ কর্মচারী কর্মরত। ভারতেও কচ ইন্ডাস্ট্রিসের তিনটি সংস্থায় ৩ হাজারেরও বেশি কর্মচারী এই মুহূর্তে কাজ করছেন। ২০১৮-এ কচ ইন্ডাস্ট্রিসের সামগ্রিক আয় ছিল ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১১ হাজার কোটি ডলার।

বিনিয়োগকারীর মুনাফা-সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু করায়ত্ত সম্পদের মাধ্যমে বিশ্বের অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিলে তা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। কচ ইন্ডাস্ট্রিস পরিবেশ ধ্বংসের কাজে জড়িয়ে আছে বলেই সংস্থাটির গতিবিধির উপর সকলের সতর্ক নজর।

পলি জমাট বেঁধে পাথরে পরিণত হলে ভূতত্ত্বর পরিভাষায় তাকে বলে পাললিক শিলা বা সেডিমেন্টারি রক। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক আলোড়নের সময় পৃথিবীর অরণ্যসম্পদের অধিকাংশই ভূগর্ভে চাপা পড়ে যায়। ভূগর্ভের চাপ ও তাপে উদ্ভিদের কাণ্ডে সঞ্চিত কার্বন স্তরীভূত হয়ে কয়লায় পরিণত হয়। প্রায় ৭ থেকে ১০ কোটি বছর আগে পাললিক শিলাস্তরে নানা ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ চাপা পড়ে। উপরীস্তরের প্রবল চাপ ও ভূগর্ভস্থ প্রচণ্ড তাপের ফলে তাদের দেহাবশেষ হাইড্রোকার্বন ও বিভিন্ন জৈবযৌগের মিশ্রণে খনিজ তেলের সৃষ্টি করে। খনিজ তেলের উপরের স্তরে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি দেখা যায়। শুধুমাত্র সছিদ্র পাললিক শিলাস্তরেই খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। সাধারণত পাললিক শিলার মধ্যে বালি, পলি ও কাদার ভাগ বেশি থাকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেল তুলে আনার প্রক্রিয়া ব্যয়সাপেক্ষ। ফলে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেল উৎপাদন এবং আমদানি-রপ্তানি নিয়ে অর্থনীতির চাপান-উতোর অব্যাহত।

শিলা তেলও আসলে পাললিক শিলার মধ্যে জমে থাকা প্রাকৃতিক তেল এবং গ্যাস। তবে এই বিশেষ ধরনের পাললিক শিলায় বালি, পলি ও কাদা থাকে না বললেই চলে। ফলে শিলা তেলের উৎপাদনের খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কাজেই শিলা তেল নিয়ন্ত্রণে থাকলে সারা বিশ্বের তেলের

দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে অসুবিধা হয় না। শিলা তেল বা শেল অয়েল নিষ্কাশনের প্রযুক্তি ১৯৬৭-তে করায়ত্ত হলেও একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাজারে আসে। শেল অয়েলের উৎপাদন বাড়তে থাকায় প্রচলিত পদ্ধতির প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের দামে হঠাৎ করে একটা লাগাম লাগে। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর দাম নিয়ে দরাদরির প্রবণতা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রিত হয়।

কানাডার নর্দান আলবার্তা এলাকার আথাবাসকা-য় প্রায় দেড় লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে শেল অয়েল বা শিলা তেল সম্পৃক্ত বালি-পাথর। এর মধ্যে এগারো লক্ষ একর জমি কচ ইন্ডাস্ট্রিস লিজ নিয়ে রেখেছে। শিলা তেল সমৃদ্ধ বালি-পাথর ছড়ানো এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ কচ ইন্ডাস্ট্রিসের শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি।

পুঁজি সবসময়ই রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। কচ ইন্ডাস্ট্রিসও তার ব্যতিক্রম নয়। উনিশশো বাইশ-এ ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ফ্রেড কচ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হওয়ার পর কর্মজীবনের সূচনাপর্বে বছর তিনেক এখানে সেখানে চাকুরি করার পর অংশীদার হিসেবে একটি মার্কিন সংস্থায় যোগদান করেন। এখানেই অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশন নিয়ে শুরু হয় ফ্রেড কচের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উনিশশো সাতাশ নাগাদ নতুন পদ্ধতিতে ভূগর্ভের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশন করে ব্যবহারের উপযোগী পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের একটি নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে বিশ্বের পেট্রোলিয়াম বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন ফ্রেড কচ। প্রতিযোগী সংস্থারা মামলা-মোকদ্দমা শুরু করল। উনিশশো ঊনত্রিশের অর্থনৈতিক মহাসংকট তখন দুয়ারে কড়া নাড়ছে। কচ উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ায় তেল ও গ্যাসের দাম কমে যাওয়ায় সরকারের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে মামলাগুলো টেকেনি। ঘরোয়া বাজারে সাফল্য লাভ করে ফ্রেড কচ আন্তর্জাতিক স্তরে সমীক্ষা শুরু করলেন। নতুন রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ইঞ্জিনিয়ারদের উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সেখানে অন্তত পনেরোটি পরিশোধনাগার সংস্থাপনে সহযোগিতা করলেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নিজের মুনাফা অর্জন করা যাবে না বুঝতে পেরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে, মধ্য প্রাচ্য এবং এশিয়ার দেশগুলোয় নিজের নতুন প্রযুক্তি ফেরি করা শুরু করলেন ফ্রেড কচ। অবশেষে হিটলারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় উনিশশো চৌত্রিশে স্থাপিত হল সেইসময়কার বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পরিশোধনাগার, হামবুর্গ রিফাইনারি। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ফ্রেড কচ চল্লিশ বছর বয়সে উনিশশো চল্লিশে নিজের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের সংস্থা। সূচনালগ্নে অন্য নাম থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তার পরিচয়, কচ ইন্ডাস্ট্রিস। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিষ্কাশনকারী অন্যান্য সংস্থাগুলিও আস্তে ধীরে ফ্রেড কচ উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার পেটেন্ট ফ্রেড কচের হাতে থাকায় পেট্রোলিয়াম শিল্পের উপর কচ ইন্ডাস্ট্রিসের নিয়ন্ত্রণ বাড়তে থাকে। সবমিলিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে পেট্রোলিয়াম বাজারে কচ ইন্ডাস্ট্রিসের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বিভিন্নভাবে অর্জিত বাড়তি পুঁজি অন্যান্য উৎপাদন, পরিষেবা, ব্যবসা ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে ক্রমশ ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করে কচ ইন্ডাস্ট্রিস।

উনিশশো পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন কমিউনিস্ট অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চলছে সেই মরশুমে ফ্রেড কচ লিখলেন,— 'জনৈক ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে সাম্যবাদ'। চল্লিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে ফ্রেড কচ ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের প্রয়াস চালালেন। দিনের পর দিন প্রভাতী খবরের কাগজের সঙ্গে এই পুস্তিকা বিতরণ করা হত। রাজনৈতিক সাফল্য তখনও অধরা। অবশেষে নিজেই একটি রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করলেন। জন বার্চ সোসাইটি নামের এই সংস্থার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য সংস্থাটি কাজ করবে। এবং সরকারের দায়িত্ব সীমিত করার বিষয়ে জনমত গড়ে তুলবে।

কচ পরিবারের আয়তনও ততদিনে বাড়তে শুরু করেছে। কচ ইন্ডাস্ট্রিসে ফ্রেড কচের চার ছেলেই যোগ দিয়েছেন। তবে উনিশশো সাতষট্টিতে ফ্রেড কচের মৃত্যুর পর প্রথম এবং চতুর্থ ভাই পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে নিজের নিজের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়েন। কচ ইন্ডাস্ট্রিসের দায়িত্ব কাঁধে নিলেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাই অর্থাৎ চার্লস ও ডেভিড কচ। এবং বিশ্বের বাজারে প্রতিষ্ঠিত হল কচ ভাইদের কর্তৃত্ব।

ফ্রেড কচ সরাসরি রাজনীতি করেননি। রিপাবলিকান দলের রক্ষণশীল অংশকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করতেন। কচ ভাইদের আমলে আড়ালটুকু সরে গেল। উনিশশো আশির দশক থেকে রাজনীতির আঙিনায় চার্লস ও ডেভিড কচের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সকলের নজরে আসে। উনিশশো আশির উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লিবারটারিয়ান দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন ডেভিড কচ। পরাস্ত। কিন্তু জেদ বেড়ে গেল। কচ ইন্ডাস্ট্রিস এবং তার সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়ে গেল। দু-হাজার ষোলোর নির্বাচনে কচ ভাইরা একশো মিলিয়ন ডলার

রিপাবলিকান ও লিবারটারিয়ান দলের জন্য খরচ করে। এবং তাঁদের প্রার্থী জয়ী হয়।

এতদিনে উন্মোচিত হল দীর্ঘ সময়ের অধ্যবসায়, রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মাদিতে বিপুল বিনিয়োগের আসল উদ্দেশ্য। নতুন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পরেই ঘোষণা করলেন যে জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরে যাবে। প্যারিস চুক্তি নামে পরিচিত এই আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপত্রে সমস্তরকম দূষণ পরিহার করার কথা বলা হয়েছে। পেট্রোলিয়ামজাত সমস্ত পণ্যের ব্যবহার সীমিত করার জন্য পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা সহমত পোষণ করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই অঙ্গীকারপত্রের অংশীদার। পৃথিবীর উষ্ণায়ন কমিয়ে আনা বা জলবায়ু সংরক্ষণের জন্য কোনো উদ্যোগে কচ ইন্ডাস্ট্রিসের প্রত্যক্ষ ক্ষতি। নিজের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কচ ভাইরাও সেই চিরায়ত নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কাজেই কচ ইন্ডাস্ট্রিসের স্বার্থরক্ষায় কচ ভাইদের মুখপাত্র হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো লুকোছাপা না করে সরাসরি প্যারিস চুক্তি অস্বীকার করলেন। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্যারিস চুক্তি রূপায়িত হলে কচ ইন্ডাস্ট্রিসের এতকালের বিনিয়োগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। কচ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি-শ্রীবৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বিশ্ব-উষ্ণায়ন তথা জলবায়ুর সংকট নিয়ে সারা পৃথিবী যখন আলোড়ন মুখর, সেই আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নীরব। তাঁর নীরবতার কারণ নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উন্নয়নশীল কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশনের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন মার্কিন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তখনই কচ ভাইদের কথা মনে পড়ে যায়।

নিজেদের দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কচ ইন্ডাস্ট্রিসের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের বন্ধু দেশ সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক আর ততটা মধুর থাকছে না। এমন লগ্নে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে সৌদি আরব আগ্রহ প্রকাশ করায় বিশ্বের রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হতে চলেছে। সৌদি আরবের চিরশত্রু ইরানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করেও রাশিয়া সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভেনেজুয়েলা থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি কমানোর কোনো সিদ্ধান্তও রাশিয়ার তরফে ঘোষণা করা হয়নি। ইরান এবং সিরিয়ার সঙ্গেও রাশিয়ার অবস্থান পালটায়নি। সবমিলিয়ে তেলের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই প্রথম একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। আর এই সুবাদে কচ ইন্ডাস্ট্রিসের আর্থিক সমৃদ্ধি-শ্রীবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। এবং একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর বাড়তে থাকবে কচ ইন্ডাস্ট্রিসের নিয়ন্ত্রণ। ফলাফল, বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন এবং উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার সার্বিক উদ্যোগ ব্যাহত হবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: রাজনৈতিক বিতর্কের রূপরেখা

শৌভিক চক্রবর্তী

আপনারা পাঠকরা অনেকেই হয়তো ২০১৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল দেখে অবাক হয়েছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, এটাও কি সম্ভব! এরকম একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর কথাবার্তা একেবারেই অসংযত, কীকরে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী, ধনী, উন্নত দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন! এই রাজনৈতিক অঘটন কীকরে সম্ভব হল? আপনাকে একটা বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারি। আপনি একেবারেই ব্যতিক্রম নন। রাজনৈতিক মহলের বড়ো বড়ো পণ্ডিতরাও এই ফলাফল দেখে রীতিমতন হতচকিত হয়ে গেছিলেন। কীকরে ঘটল এই অকল্পনীয় নির্বাচনী ফলাফল? ২০২০ সালের মার্কিন দেশের নির্বাচনে কী ঘটতে চলেছে বা এখন মার্কিন দেশের রাজনীতিতে যে দৈনন্দিন ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে, সেটা ব্যাখ্যা করতে গেলে আগে একটু ২০১৬-তে এই নির্বাচনী ফলাফল হল কেন তা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

২০১৬ নির্বাচনের রায়

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে ২০১৬ সালের ওই নির্বাচনের অভূতপূর্ব ফলাফলের অনেক ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। তাঁদের অনেকের মতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পেছনে প্রধানত দায়ী। ২০০৮ এবং ২০০৯ সালের মন্দার পরে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওবামা যদিও কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ওই মন্দার পরিস্থিতি থেকে অর্থব্যবস্থার উত্তরণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। এবং পরিমাণের থেকেও বড়ো সমস্যা হল সেই নীতির দ্বারা যে অর্থ বণ্টন করা হয়েছিল, তার বেশিরভাগটাই ধনী মানুষদের মধ্যেই সীমিত ছিল। শ্রমিক শ্রেণির হাতে নামমাত্র কিছু পৌঁছেছিল— তাঁদের জীবনযাত্রায় সেই অর্থে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। মার্কিন দেশের শ্রমজীবী মানুষদের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনযাপন করাটাই একটা সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল। ক্রমাগত পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। চাকরির অভাব, কম বেতন, খরচ-সাপেক্ষ স্বাস্থ্যব্যবস্থা, এবং ব্যয়বহুল উচ্চশিক্ষা, শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ করে দেয়। অন্যদিকে, রাজনৈতিক নেতাদের এই ঘ্যানঘ্যানে ভাষণ এবং প্রতিশ্রুতি। এই প্রেক্ষাপটেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক উত্থান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলত দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচন হয়— রিপাবলিকান (republican) আর ডেমোক্র্যাট (democrat)। এবং, দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় কে রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্রপতি পদের প্রতিনিধি হবে। একেই বলা হয় প্রাইমারি (primary)— যা এখন চলছে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে। ২০১৬-র নির্বাচনের আগে দু-দলের মধ্যেই হয়েছিল এই অভ্যন্তরীণ লড়াই। রিপাবলিকানদের মধ্যে জয়ী হয়েছিল ট্রাম্প। নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা প্রমাণ করার জন্য, উনি তথাকথিত সমস্ত রাজনৈতিক নিয়ম ও সামাজিক প্রথাকে উপেক্ষা করে, কিছু অদ্ভুত এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মধ্যে দিয়ে রিপাবলিকান দলের সমর্থকদের মন জয় করতে পেরেছিলেন। এই প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হল মেক্সিকোর সীমান্তে দেওয়াল নির্মাণ, মুসলমানদের সাময়িকভাবে দেশে ঢুকতে না দেওয়া, বন্ধ কারখানা খোলা এবং চাকরি ফিরিয়ে আনা, করের ওপর ছাড় দেওয়া, ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে প্রধানত শ্বেতাঙ্গ বর্ণের শ্রমজীবী মানুষের কাছে তাঁদের বেশিরভাগ সমস্যার পরিত্রাতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবং একই সঙ্গে ট্রাম্প মার্কিন সমাজের এক রূঢ় সত্যকে আবার সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন— স্বাজাতিকতা। এক বড়ো অংশের শ্বেতাঙ্গ বর্ণের মানুষের মধ্যে চাগিয়ে তুলল অন্য বর্ণের এবং ধর্মের মানুষের প্রতি ঘৃণা। শ্রমিকদের দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য দায়ী করল মেক্সিকো, ভারত ও চিন-এর মতন গরিব দেশগুলোকে। কিছু মাসের মধ্যেই রিপাবলিকান দলের সমর্থকদের কাছে নিজেকে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন ট্রাম্প।

অন্যদিকে, ওই একই সময়ে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যেও আরেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটছিল। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে বেশিরভাগ সমর্থকেরই ধারণা ছিল যে ওবামার পরে হিলারি ক্লিনটন-ই তাঁদের দলের পদপ্রার্থী হবেন। কিন্তু এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে। ২০১৬ সালের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে হিলারিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিলেন এক দীর্ঘকালের বাম রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পরিচিত বার্নি স্যান্ডার্স। অবশ্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ওই অভ্যন্তরীণ লড়াইতে হেরে যায় বার্নি। অনেকেই মনে করেন, বিশেষত বার্নির সমর্থকেরা, যে ওই প্রাইমারির লড়াইটা নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করেনি সেই সময়ের ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতৃত্ব। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভেতরেই কারচুপি করে হারিয়ে দেওয়া হয় বার্নিকে। এই মর্মে কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। নির্বাচনে হেরে গেলেও, বার্নি মার্কিন মানুষদের কাছে কিছু বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল— সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা তৈরি করা ('মেডিকেয়ার ফর অল'), ১৫ ডলার ন্যূনতম বেতন, টিউশন-ফি মুক্ত কলেজ, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই। আপনারা পাঠকরা অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে এই আগের নির্বাচনের এসব কথা এখন এত বলে আর কী লাভ। এই ঘটনাগুলি তো মোটামুটি আমরা সবাই জানি। কিন্তু মনে রাখবেন আজকের দিনে মার্কিন রাজনীতিতে কী ঘটছে, সেটা বুঝতে গেলে আগের নির্বাচনের প্রাইমারি-তে কী ঘটেছিল সেটা মাথায় রাখাটা অত্যধিক জরুরি। আজ মার্কিন দেশের রাজনীতিতে দৈনন্দিন যা ঘটছে আপনাদের চোখের সামনে, তার বেশিরভাগ বীজই পোঁতা হয়েছিল ওই সময়েই।

২০১৬-র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হওয়া মাত্র বোঝা গেল যে ডোলাল্ড ট্রাম্প কোনো তথাকথিত রাজনৈতিক নিয়ম-কানুনের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে একটুও ইচ্ছুক নন। বিপক্ষের প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে জেলে পাঠানোর হুমকিকে সমর্থন করা থেকে শুরু করে, বর্ণবিদ্বেষের সাহায্যে সমাজের মধ্যে ঘৃণা ছড়াতেও তাঁর এতটুকু বাধেনি। হিলারি ক্লিনটন, অন্যদিকে, তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিধির মধ্যেই নিজের প্রচার করেছিলেন। তার ফল কী হল আমরা সবাই জানি। ২০১৬-তে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বেশি ভোট না পেলেও, ইলেকটোরাল কলেজের সাহায্যে রাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হতবাক হয়ে গেছিল ক্লিনটনের শিবির। শুধু ক্লিনটন শিবির নয়, বিশ্বজুড়েই অবাক হয়ে যান অনেক নেতা ও পণ্ডিত মানুষ। বিস্মিত হয়ে গেছিল আমার আপনার মতন অজস্র সাধারণ মানুষও।

২০২০ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

সেখান থেকে এখন অবধি তিন বছর কেটে যায়। এর মধ্যে রাজনৈতিক জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতায় নির্বাচন জেতার অভিযোগ ওঠে। মুলারকে সেই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হলেও, নির্ধারিতভাবে ট্রাম্পকে সেই দোষে কোনোভাবে দোষারোপ করা সম্ভবপর হয়নি। পাঁচশোটি সাক্ষাৎকার, পাঁচশোটি তল্লাশি পরোয়ানা এবং ২৩০০টি লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্যের পরে, ২৩ মাস তদন্তের শেষে প্রকাশিত মুলার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'তদন্তকারীদের সামনে এমন কিছু কঠিন পরিস্থিতি ছিল যার ফলে সত্যিই বলা মুশকিল যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রুশ হস্তক্ষেপ বিষয়ে তদন্তে বাধা দিয়েছিলেন কি না। হোয়াইট হাউসের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার যে-টুকু আইনি স্বাধীনতা ছিল, তাতে রুশ হস্তক্ষেপের সঙ্গে ট্রাম্পের প্রচারের সম্পর্ক ছিল কি না, বলা সম্ভব নয়।' ইতিমধ্যে ট্রাম্পের আত্মবিশ্বাসও বেড়েই চলে। ট্রাম্প সরকারের তরফ থেকে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয় যা তার পার্টির সমর্থকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারে এক অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে, মেক্সিকো এবং মার্কিন দেশের মধ্যে একটা দেওয়াল নির্মাণ করবেন এবং সেই দেওয়ালের খরচ-বহন করবে মেক্সিকো দেশের সরকার। যখন বলেছিলেন তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল এ এক হাস্যকর অবাস্তব প্রস্তাব। কিন্তু দেখা গেল নির্বাচনের কিছু দিন পরেই বাস্তব রূপ নিচ্ছে ওই দেওয়াল। যদিও মেক্সিকো সরকার ওই দেওয়ালের খরচ বহন করতে অস্বীকার করে দেন। ট্রাম্প কর কমানোর যে প্রস্তাব দেন, সেটাও আইনে রূপান্তরিত হয়। ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলে।

একদিকে এই সমস্ত নতুন নীতির জন্য ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা যেমন বাড়ছিল, তেমনই অন্যদিকে কিছু নীতির বিরোধিতাও বাড়তে শুরু করে। সংবাদমাধ্যমে একটি বিষয় নিয়ে খুবই হইচই হয়— অভিবাসন নীতি (immigration policy)। ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি তাঁর নিজের সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিলেও, প্রচুর সাধারণ মানুষ এই নীতির বিরোধিতা করে। এই একই কারণে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তাও অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সন্তানদের তাঁদের মা এবং পরিবার থেকে আলাদা করে দেওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে খাঁচা-বন্দী করে রাখাকে মার্কিন দেশের সংবাদমাধ্যম এবং বেশিরভাগ মানুষই খুব একটা ভালো দৃষ্টিতে নেয়নি। এবং ট্রাম্পের নিজের মাঝেমাঝেই বেপরোয়া আচরণ ও মন্তব্য এবং অধিকাংশ সময় মিথ্যা কথা বলাকে, সাধারণ মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি।

এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হল ইউক্রেন দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর টেলিফোনে কথোপকথন এবং সেখান থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অপসারণ বা ইমপিচমেন্ট তদন্ত (impeachmehnt enquiry) ঘটনাটি রাজনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য, এর প্রভাব ভোটারদের মধ্যে কতটা পড়বে তা সঠিকভাবে বলতে পারা এই মুহূর্তে বেশ কঠিন।

অবশ্য এই ঘটনাগুলো থেকে এইটা বলা যেতে পারে যে ট্রাম্পের বিরোধী শিবির— ডেমোক্র্যাটিক পার্টির— শক্তি একটু একটু করে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২০১৮ সালে কংগ্রেস-এ অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করে। ৪৩৫টি আসনের মধ্যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২৩৫টি আসন জেতে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের তুলনায়, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ৪১টি বেশি আসন লাভ করে এবং ৫.৪% বেশি ভোট পায়। ডেমোক্র্যাটদের তরফে নান্সী পেলোসি হাউস-এর স্পিকার এবং দলনেত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, কিছু অশ্বেতাঙ্গ মহিলা প্রার্থীর এই নির্বাচনে জয়লাভ করা। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে যাদের নাম এখানে বলা প্রয়োজন তাঁরা হচ্ছেন নিউ ইয়র্কের আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্তেজ, মিশিগানের রশিদা তালিব, মিনেসোটার ইলহাম ওমার, এবং ম্যাসাচুসেটসের আয়েনা প্রেসলি। এঁদের এই চারজনের দলকে আপনারা অনেকেই হয়তো 'স্কোয়াড' নামে ডাকা হচ্ছে বলে শুনেছেন। এই চারজনই রাজনৈতিক মহলে খুব প্রগতিশীল হিসেবেই পরিচিত। কীকরে সম্ভব হল এঁদের নির্বাচন, যেখানে অন্যদিকে দেখতে গেলে ট্রাম্পের সাহায্যে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। মনে পড়ছে, আপনাদের বলেছিলাম যে ২০১৬-র প্রাইমারিতেই, আজ আমরা যা দেখছি, তার বীজ পোঁতা হয়েছিল। এই সমস্ত প্রগতিশীল নারীদের জয় তারই একটা দিক। এবং, এই জয়যাত্রার প্রধান কাণ্ডারি হল বার্নি স্যান্ডার্স-এর স্থিরসংকল্প, প্রগতিশীল ও বাম রাজনীতি। আয়েনা বাদে, বাকি ৩-জনই বার্নিকে এই ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন। তাই, এই কারণে বার্নি স্যান্ডার্সের রাজনৈতিক জীবন, আদর্শ এবং এই তরুণ প্রজন্মের উপর তাঁর প্রভাব খুবই প্রাসঙ্গিক।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হওয়ার দৌড়

বার্নি স্যান্ডার্স হচ্ছেন ভারমন্ট রাজ্যের থেকে নির্বাচিত আমেরিকান সেনেট-এর প্রতিনিধি। তাঁর রাজনীতি জীবনের শুরু ছাত্রাবস্থায় সোশ্যালিস্ট পার্টি অব আমেরিকা-র যুব-শাখা ইয়ং পিপলস সোশ্যালিস্ট লীগ-এর সদস্য হিসেবে। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে নাগরিকাধিকার আন্দোলনের সাথে উনি যুক্ত ছিলেন। ওই একই সময়ে উনি ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিলেন এবং তারই দরুন লিবার্টি ইউনিয়ন পার্টির সদস্য হন ১৯৭১ সালে। ওই দশকেই বার্নি গভর্নর এবং সেনেটের মেম্বার হবার জন্য নির্বাচনে দাঁড়ান, কিন্তু তিনি জয়লাভ করতে পারেননি। ১৯৮০ সালে তিনি ভারমন্ট রাজ্যের এক শহর বার্লিংতন-এর মেয়র হিসেবে জয়লাভ করেন এবং ৮ বছর সেই পদের অধিকারী ছিলেন। তারপর ১৯৯১ সালে তিনি কংগ্রেসে জয়ী হয়ে আসেন। ২০০৬ সালে তিনি প্রথমবার সেনেটের নির্বাচনে জয়ী হন এবং সম্প্রতি ২০১৮-তে ওই পদেই আবার জয়লাভ করেন।

২০১৬ সালে উনি যখন প্রাইমারি-র লড়াইতে নিজের নাম উল্লেখ করেন তখন জনসমর্থন যে প্রচুর ছিল তা নয়। কিন্তু ওই পদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর পরে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তিনি কিছু প্রস্তাব দেন যা ওই সময়ে মার্কিন রাজনীতিতে অনেকটাই কল্পনার বাইরে ছিল। উনি কোনো বড়ো ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা নিতে অস্বীকার করে দেন। গড়ে ২৭ ডলার করে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে টাকা তুলে নির্বাচনী প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন। উনি ধনীদের উপর অধিক কর বাড়ানোর কথা এবং ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ার বাজারের ওপর নিয়মকানুন শক্ত করার প্রস্তাব দেন। বলা বাহুল্য, মার্কিন পুঁজিপতিদের মধ্যে এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যে এই প্রচার একটা প্রগতিশীল দিশা নিয়ে আসে। তরুণরা নতুন উদ্যমে তাঁর প্রচারে অংশগ্রহণ করতে থাকে। বহু সামাজিক প্রগতিশীল নীতি যেমন সকলের জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা, বেতন-বিহীন উচ্চশিক্ষা, সদ্য নবজাত শিশুর জন্য মা-বাবার ছুটি এবং ১৫ ডলার ন্যূনতম বেতনের প্রস্তাব প্রবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

২০২০-র ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারি পদের প্রার্থী এলিজাবেথ ওয়ারেন এবং কমলা হ্যারিস দুজনেই বার্নির প্রস্তাবের সিংহভাগের পক্ষেই নিজেদের সমর্থন জানিয়েছেন। যদিও এখানে বলে রাখা ভালো যে বার্নি নিজেকে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট হিসেবে প্রচার করলেও, বাকিরা নিজেদের পুঁজিবাদের সমর্থক হিসেবেই তুলে ধরেছেন। অনেক পণ্ডিতের মতে রাজনৈতিক কৌশলের দিক দিয়ে এটা হয়তো বার্নির ভুল পদক্ষেপ হয়ে গেছে মার্কিন ভোটারদের কাছে। কারণ মার্কিনদের কাছে সোশ্যালিজম কথাটির একটা নেতিবাচক প্রভাব আছে। এবং, ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে তাই হয়তো এখন এলিজাবেথ ওয়ারেন বার্নির থেকে জনপ্রিয়তায় কিছুটা এগিয়ে আছেন।

ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে বার্নির প্রধান বিরোধী শিবির এই সোশ্যালিজম বিরোধী প্রচারকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

সেই শিবিরের প্রধান নেতা হলেন জো বাইডেন— প্রাক্তন মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি, ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা এবং প্রাইমারি রেসে এখন শীর্ষ তালিকায় যাঁর স্থান। জো বাইডেন হলেন ডেমোক্র্যাট পার্টির আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রার্থী। বার্নির প্রভাবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে যে একটা বাম হাওয়া বয়ে চলেছে, জো সেই হাওয়াকেই থামাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। এবং পূর্ব উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার দরুন, উনি ওবামার অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায়ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জো ২০২০-র নির্বাচনী লড়াইকে 'দেশের আত্মার লড়াই' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই লড়াইকে উনি মার্কিন রাজনীতির তথাকথিত নিয়মাবলীর মধ্যে থেকেই লড়তে চান। এর একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাক। বার্নি জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানির মালিকদের অপরাধী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বার্নির রাজনৈতিক প্রভাবের চাপে পড়ে, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারির শীর্ষে থাকা অনেকেই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নির্বাচনী প্রচারের জন্য টাকা নিতে অস্বীকার করেছেন। বাইডেন সেই পথে হাঁটতে রাজি হননি। ওনার মতে এই পুঁজিবাদী ও রিপাবলিকানদের শত্রু হিসেবে দেখাটা একটা ভুল রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এখানে বলা বাহুল্য যে সংবাদমাধ্যম এবং অনেক পুঁজিপতি জো-এর সমর্থনেই প্রচার করছেন।

সন্ধিক্ষণে মার্কিন রাজনীতি

এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে কে ডেমোক্র্যাট পার্টির সদস্যদের মন জয় করতে পারবে এবং প্রাইমারিতে জয়লাভ করবে, তা একমাত্র সময়ই উত্তর দিতে পারবে। এই নিয়ে এখনই জল্পনাকল্পনা করে খুব একটা লাভ নেই। কিন্তু একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার করে এখন বলে রাখা হয়তো ভালো। আমার ব্যক্তিগত ধারণা মার্কিন দেশের মানুষকে এখন তথাকথিত রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার মধ্যে হয়তো আর বেঁধে রাখা সম্ভবপর হবে না। ২০১৬-র নির্বাচনের ফলাফল আমার মতে কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং ঠিক উলটো। ২০১৬ সাল হল মার্কিন দেশে এক নতুন রাজনৈতিক মোড়। ২০২০-তে মার্কিন ভোটাররা ডান না বাম— কাদের দিকে নিজেদের সমর্থন জানাবেন, তা কেবল সময়ই বলতে পারবে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা এই দেশের মানুষ আর মধ্যপথে হাঁটতে খুব একটা ইচ্ছুক নন। সেই অর্থে বলতে গেলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত প্রগতিশীল, বাম সমর্থকদের জন্য আগামী দিনের লড়াই বড়োই কঠিন হতে চলেছে।

রাল্‌ফ মিলিবান্ড, বিখ্যাত মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী, তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বই— দ্য স্টেট ইন আ ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি-তে বলেছেন যে একটা পুঁজিবাদী সমাজ নিজের মধ্যে অনেক প্রকারের রাজনৈতিক সরকারি শাসনব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তা সেই শাসনব্যবস্থা যতই নির্মম এবং স্বৈরাচারী হোক না কেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করে এবং তাঁর সমর্থনে জনমত তৈরি করে, আজকের মার্কিন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং তাঁর রাজনীতি এই তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। কিন্তু যা এখনও কোথাও কোনোদিন প্রমাণিত হয়নি তা হল পুঁজিবাদ কোনো ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবে কিনা? প্রশ্নটার সঠিক জবাব দেওয়া এই মুহূর্তে কঠিন এবং বার্নি শিবিরও, আমার ধারণা, হয়তো একই চিন্তায় চিন্তিত। সেই কারণেই মার্কিন দেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা বারবার ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের কথা তুলে আনছেন। কিন্তু এই কৌশলে কতটা মানুষ প্রভাবিত হবেন, তার উত্তরের জন্য আমাদের হয়তো আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সমর বাগচী

পৃথিবী আজ এক গভীর পরিবেশ ও সামাজিক সংকটে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধি অনেকদিন আগে বুঝেছিলেন এই ভোগবাদক্লিষ্ট শিল্প-সভ্যতার সংকটকে। ১৯৪১ সালে, মৃত্যুর বছরে, লিখছেন 'সভ্যতার সংকট'। ১৯৪০ সালে আমেরিকায় অধ্যাপনারত কবি অমিয় চক্রবর্তী লিখছেন, 'ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক, ক্ষত্রিয়ের শক্তি এবং শূদ্রের শ্রম ব্যবহার করে আজকের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির ইউরোপকে আর ঠেকানো যাচ্ছে না। কিন্তু, আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের পা একটা আনত তলে বিলুপ্তির পথে।' গান্ধি লিখছেন, 'ঈশ্বর করুন ভারত যেন কোনোদিন পশ্চিমের মতো শিল্পায়ন না করে। একটা ছোট্ট দ্বীপ দেশ আজ সারা পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করেছে। আজ যদি ৩০ কোটির একটা মস্ত দেশ একইরকম অর্থনৈতিক শোষণ করে তাহলে সমস্ত পৃথিবী পঙ্গপাল পড়ার মতো নিঃস্ব হয়ে যাবে।' রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে লিখছেন, 'বিলাসের ফাঁস'। আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়েন লিখছেন, 'সভ্যতা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় চাহিদার অনন্ত বৃদ্ধি।' আজ, সারা পৃথিবীর ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের আগ্রাসী ভোগবাদ পৃথিবীকে ধ্বংসের কিনারায় এনে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ জাপানে তিনটে বক্তৃতা দেন। ১৯১৬ সালে জাপানে 'Nationalism' সম্বন্ধে বক্তৃতায় পশ্চিমী সভ্যতা সম্বন্ধে বলছেন, 'Before this political civilization came to its power and opened its hungry jaws wide enough to gulp down great continents of the earth, we had wars, pillages, monarchies and consequent miseries, but never such a sight of frightful and hopeless voracity, such wholesale feeding of nation upon nation, and huge machine for turning great portions of the earth into mincemeat. ... This political civilization is scientific, not human.' আরেকটি বক্তৃতায় বলেছেন, 'We had wars, pillages, changes of monarchy and consequent miseries. But never such a sight of fearful and hopeless voracity, such wholesale feeding of nation, such huge machines for turning great portions of the earth into mincemeat, never such terrible jealousies with all their ugly teeth and claws ready for tearing open each other's vitals.' বক্তৃতার পর জাপানের বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সমালোচিত হন। এ বিষয়ে আমেরিকায় বক্তৃতার পরও সমালোচনার ঝড় বয়।

আজকের যে জলবায়ুর জরুরি অবস্থা এসেছে তার কারণ ধনী মানুষের প্রকৃতিকে অপর্যাপ্ত শোষণ করার পরিণতি। পুঁজিবাদী শিল্প সভ্যতা তার অর্থনীতিতে এবং ভোগে অবিরাম বৃদ্ধি চায়। কিন্তু প্রকৃতির যে সম্পদ— জল, আকরিক ইত্যাদি তা তো সীমিত। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে ওই যে লোভ তা একদিন মানুষে মানুষে অনবরত যুদ্ধ সৃষ্টি করবে। তিনি বুঝেছিলেন যে আধুনিক যুদ্ধ মানুষ ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করবে। দেশে দেশে মিলিটারি শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। আজ আমেরিকার অর্থনীতি যুদ্ধাস্ত্র শিল্পের ওপর দাঁড়িয়ে। মানব সভ্যতা আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'The gigantic organizations of hurting others and warding off their blows, for making money by dragging others back, will not help us. On the contrary, by their crushing weight, their enormous cost, and their deadening effect upon the living humanity, they will seriously impede their freedom.' সামরিক শক্তি, জাতি বিদ্বেষ এবং শিল্পের অমানবিক বৃদ্ধি প্রাকৃতিক জগৎকে যে একেবারে পালটে দেবে তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। আজকের শিল্পায়িত যুদ্ধের মানুষ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার যে ক্ষমতা তা রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি। আজকে, এমনকী যারা আমেরিকার মিলিটারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তারাও বুঝতে পারছে বিশ্বতাপ বৃদ্ধি ও জলবায়ু বিপর্যয়ের বিপদ।

এটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে

আজকের এই যে বৃহৎ শিল্পায়িত মিলিটারি ব্যবস্থা তা আমাদের গ্রহের সবচেয়ে বৃহৎ গ্রিন হাউস গ্যাসের জনক। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'যুদ্ধ ব্যবস্থার খরচ' এই নামে প্রজেক্ট জানাচ্ছে: আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স-এর যে কার্বন ফুটপ্রিন্ট তা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের চেয়ে বেশি। আমেরিকার প্রায় হাজার খানেক মিলিটারি ঘাঁটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, 'Indeed, the DOD (Department of Defence) is the world's largest institutional user of petroleum and correspondingly, the single largest producer of greenhouse gases in the world.' এই যে এত মিলিটারি ব্যবস্থা তার প্রধান উদ্দেশ্য যুদ্ধ। তাই যুদ্ধই হচ্ছে সবথেকে বেশি দায়ী বাতাসে কার্বন ছাড়ার জন্য।

২০০১ সালে সোভিয়েতের হাত থেকে আফগানিস্তানকে মুক্ত করার পর আমেরিকান মিলিটারি ১২০ কোটি টন কার্বন বাতাসে ছেড়েছে, যেখানে ইংল্যান্ড সারা বছরে ছাড়ে প্রায় ৩৬ কোটি টন। ১৮ বছর আগগানিস্তানকে দখলে রাখার পর আজ আমেরিকা তালিবানের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে উদ্যত।

এই যে আমাদের গ্রহে এত কার্বন ছাড়ছে আমেরিকার যুদ্ধ ব্যবস্থা তার যৌক্তিকতা থাকত যদি সত্যিই তা জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে করা হচ্ছে। কিন্তু, আমেরিকার মিলিটারির সবচেয়ে বেশি কার্বন ফুটপ্রিন্ট লাগছে যুদ্ধ এবং অন্য দেশ দখলে রাখার জন্য যা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

আমেরিকার অর্থনীতি আজ দাঁড়িয়ে আছে প্রধানত যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়। তাই তার অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন সারা বিশ্বে ছোটো ছোটো যুদ্ধ লাগিয়ে রাখা এবং অস্ত্র বেচা। তাই আজ আমেরিকায় একটি আন্দোলন দানা বাঁধছে, 'World Beyond War'। তারা আমেরিকান সরকারের কাছে দাবি করছে সারা বিশ্ব জুড়ে যে এক হাজারের মতো মিলিটারি ঘাঁটি আছে আমেরিকা তা অবিলম্বে বন্ধ করুক এবং সেই অর্থ আমেরিকার মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করুক। তাই আজ পরিবেশ এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তাকে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। আমেরিকার আফগানিস্তানে অবস্থানের একটি কারণ হিসেবে বলা হত ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের ধ্বংস। কিন্তু, দুই দশক লড়াইয়ের পর দেখা যাচ্ছে তা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করেনি। ওই ২০০১ সালেই তালিবানের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করা যেত যখন আন্তর্জাতিক মিলিটারি আক্রমণের মুখে তালিবান প্রায় ভেঙে পড়েছিল। তা না করে আমেরিকা আফগানিস্তান দখলে রেখে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। ফল হল যে তালিবান আবার জেগে উঠেছে। কম করে ১ লক্ষ ১০ হাজার মানুষ মারা গেছে এবং পরিবেশের বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

আফগানিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোটি কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছাড়া ছাড়াও আফগানিস্তানের পরিবেশে ধ্বংস ডেকে আনা হয়েছে। অরণ্য বিরাটভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্জ্য পদার্থ এবং অন্যান্য কারণে আমেরিকান মিলিটারি টক্সিক দূষিত পদার্থ বাতাসে ছাড়ে যার ফলে আফগানিস্তানের মানুষ এবং আমেরিকার ওয়ার ভেটেরানরা নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

ইরাকের যুদ্ধ সেখানকার পরিবেশে ধ্বংস ডেকে আনে। আমেরিকার মিলিটারির যুদ্ধ এবং পরবর্তী কার্যক্রম শুধুই কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণই ঘটায়নি, পরিবেশের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। পরিবেশ এত টক্সিক হয়ে গেছে যে কোনো কোনো জায়গায় ক্যানসার এবং শিশুদের জন্মগত বিকলাঙ্গতা বিরাটভাবে বেড়ে গেছে। ইরাকের ফালুজা অঞ্চলে আমেরিকার মিলিটারি যুদ্ধ প্রক্রিয়ার জন্য পরিবেশে কী ক্ষতি হয়েছে তার ওপর দুটি স্টাডি হয়। তার মধ্যে একজন ব্রিটিশ ডাক্তার জানিয়েছেন যে ফালুজার ওপর আমেরিকার যে মিলিটারি আক্রমণ হয় তাতে সেখানকার জনগণের, 'the highest rate of genetic damage in any population ever studied'। ওই ডাক্তার জানান যে রোগের এই প্রাদুর্ভাবের কারণ আমেরিকার সৈন্যের ক্ষয়ে যাওয়া ইউরেনিয়াম (depleted uranium)-এর ব্যবহার। যদিও আমেরিকা জানায় যে তার সৈন্য আর ওই ক্ষয়ে যাওয়া ইউরেনিয়াম ব্যবহার করবে না; কিন্তু Air Wars and Foreign Policy Magazine জানাচ্ছে যে আমেরিকান সৈন্য সিরিয়ায় সাম্প্রতিক যুদ্ধে ওই বিষাক্ত যুদ্ধ উপকরণ ব্যবহার করেছে।

যুদ্ধে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের এক বড়ো কারণ। বেশ কয়েক দশক জুড়ে মধ্য প্রাচ্যে আমেরিকার যে মিলিটারি ফুটপ্রিন্ট তার একটি বড়ো কারণ সেখানকার তৈল সম্পদের ওপর অধিকার স্থাপন করা। ওই তৈল সম্পদের শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাই পৃথিবীর কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎসারণের প্রধান কারণ। এক কথায় বলতে গেলে পৃথিবীতে এই যে এত মৃত্যু, দূষণ তার প্রধান কারণ হচ্ছে ওই তৈল সম্পদের ওপর অধিকার ও যান্ত্রিক উত্তোলন। এবং এরই ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন। যান্ত্রিক যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যান্ত্রিক উত্তোলন ব্যবস্থাই আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের কিনারায় এনে ফেলেছে। এই যে এত যুদ্ধে, রক্ত, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন তা যে সম্ভব হচ্ছে তার একটি বড়ো কারণ হচ্ছে জনসধারণের উদাসীনতা। এটি ঠিক নয় যে জনসাধারণ এ বিষয়ে চিন্তিত নয়। ইরাক যুদ্ধের আগে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমেছিল ওই যুদ্ধের বিরুদ্ধে। বহু বছর ধরে আমেরিকায় খুব

সচেতন পরিবেশ আন্দোলন চালু ছিল। আমেরিকাতেই প্রথম পৃথিবী দিবস চালু হয় ১৯৫০ সালে।

এই যে প্রকৃতির ধ্বংস তা মিডিয়া বা রাজনীতির আলোচনায় আসছে না। এর কারণ এইসব যুদ্ধে বা প্রকৃতির ধ্বংসে কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? আমরা জানি যে যুদ্ধের জন্যে যে মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতি তা ঘটছে তৃতীয় বিশ্বের দেশে। প্রকৃতির ধ্বংসলীলা প্রথমত ভোগ করেছে বাদামী চামড়ার মানুষেরা ব্রাজিলে, বাংলাদেশে, মালদিভে এবং বাহামার মতো দেশ। যতক্ষণ প্রাকৃতিক সংকট বা যুদ্ধ আমেরিকাকে বা শিল্পোন্নত দেশকে না ছুঁচ্ছে ততক্ষণ সেখানকার সরকার ও ধনী মানুষ এই সংকটকে জরুরি অবস্থা বলে মনে করবে না।

একদিন না একদিন পৃথিবীর সব দেশকেই এই সংকট গ্রাস করবে। এই বছর মার্চ মাসে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৪১৫ পিপিএমে পৌঁছেছে। এই পরিমাণ কার্বন বাতাসে জমেছিল আজ থেকে প্রায় আট লক্ষ বছর আগে। সে সময়ে দক্ষিণ মেরু নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল আজকের চেয়ে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সমুদ্রের উচ্চতা আজকের চেয়ে ৬০ ফিট বেশি ছিল। আমরা যদি কার্বন নিঃসরণ বন্ধ না করি এবং বাতাসে এখনই যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে তাকে কমাতে না পারি তাহলে পৃথিবীর অবস্থা সেই আট লক্ষ বছর আগেকার মতো হবে। এই অবস্থার পদধ্বনি শোনা সত্ত্বেও পৃথিবীর কার্বন নিঃসরণ বেড়েই চলেছে।

এটি হাস্যকর ব্যাপার, যে আমেরিকার পেন্টাগন আজকের সংকটের কারণ সেই প্রতিষ্ঠানই আজ জলবায়ু পরিবর্তন স্বীকার করছে না। কর্নেল Lawrence Wilkerson যিনি Gen. Colin Powell-এর পূর্বতন chief of staff ছিলেন তিনি বলেছেন, 'The only department in Washington that is clearly and completely seized with the idea that climate change is real is the Department of Defence'। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, খাদ্যাভাব, বৈদেশিক প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে দেশান্তরী সমস্যা সৃষ্টি হবে তার রূপরেখা আমেরিকার মিলিটারি নির্মাণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বরফ কীরকম গলে যাচ্ছে তার আগাম বার্তা দেওয়ার জন্য যে টাস্ক ফোর্স বর্তমান ছিল তা আমেরিকার নৌবাহিনী বন্ধ করে দেয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত যিনি নৌবাহিনীর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন তাঁর কথায়, 'The task force ended, in my opinion, without full incorporation of climate change considerations.'

আমরা ভাবি যে বিংশ শতাব্দী হচ্ছে প্রধানত জাগতিক উন্নয়নের সময়। এটিও আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই শতাব্দীতে অভাবনীয় রক্তপাত ঘটেছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি।

আমরা মনে করি যে বিংশ শতাব্দী হচ্ছে বস্তুগত উন্নয়নের শতাব্দী। কিন্তু এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই যুগ হচ্ছে সেই যুগ যখন ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব রক্তক্ষয় ঘটেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে মানুষের মনের যে অন্ধকার দিক আছে তাকে হাতিয়ার করে। আমেরিকার World Beyond War বলে যে গ্রুপ আছে তারা জানাচ্ছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ২ কোটি মানুষ হত্যা করেছে বা হত্যা করতে সাহায্য করেছে। ৩৬টি বিদেশি সরকারের পতন ঘটিয়েছে, বিদেশি দেশের ৮৪টি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে, ৫০টি বিদেশি হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে এবং ৩০টি দেশের ওপর বোমা ফেলেছে। আমেরিকার মিলিটারির পেছনে ব্যয় হচ্ছে বছরে ১২০০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ, ১২০০০০ কোটি ডলার। সেখানে, মাত্র ১৯টি দেশ বছরে ১০০০ কোটি ডলারের কিছু বেশি খরচ করে। ওই ১৯টির মধ্যে ১৭টি আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্র, নাটো-র (NATO) দেশগুলো। বিংশ শতাব্দী মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বর হিংস্র শতাব্দী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার পৈশাচিক ট্যাঙ্ক, বোমারু প্লেন, বিষাক্ত গ্যাস, এবং পরমাণু বোমা ব্যবহার করে ৭ কোটির বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যে এটম বোমা ফেলা হয়েছিল তার ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তায় আজও জাপানের হিরাকুসারা ভুগছে।

বিশ্বতাপ বৃদ্ধির ফলে উত্তর মেরুর বরফ ও পারমাফ্রস্ট গলে শুধু আমাদের গ্রহে একটি এমারজেন্সিই ডেকে আনছে না, আমেরিকা, রাশিয়া এবং চিনের মধ্যে এক নতুন যুদ্ধের আবহাওয়াও তৈরি করছে। পৃথিবী ধ্বংসের কিনারায় এসে পড়া সত্ত্বেও আরো আরো শোষণ এবং হিংসার ভিত নির্মাণ হচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ মারা যান। তিনি এটম বোমার ব্যবহার দেখে যাননি। তিনি বহুদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন লোভের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি, ন্যাশনালিজমের প্রসার ও দেশে দেশে মিলিটারির সংখ্যা ও অস্ত্রায়ণ বৃদ্ধি প্রকৃতির সর্বনাশ ডেকে আনবে। আজ তাঁর ওই চিন্তা ভবিষ্যৎবাণী বলে মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'If this persists indefinitely and armaments go on exaggerating themselves to unimaginable absurdities, and machines and storehouses envelop this fair earth with their dirt and smoke and ugliness

then it will end in a conflagration of suicide.' কবি জীবনানন্দের সেই লাইনগুলিও যেন সত্যি হয়ে যাচ্ছে, 'অদ্ভূত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা/যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া/যাদের গভীর আস্থা আছে মানুষের প্রতি/এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য কিংবা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।'

তথ্যসূত্র

ইন্টারনেট

নখাগ্রে নক্ষত্ররাজি

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

কোনোদিন ভাবিনি নবনীতা দেব সেনের রচনাবলি সম্পাদনা করব। ২০১৭-র গ্রীষ্মের এক সন্ধেয় যখন ওষ্ঠাগত প্রাণ, একটু খোলা বাতাসের সন্ধানে ছাতে পায়চারি করছি পরিবারের তিনটি চরিত্র, তখনই নবনীতাদির ফোনটা আসে। সরাসরি প্রস্তাব করলেন তাঁর রচনাবলি সম্পাদনা করার। এপ্রান্তে আমি হ্যাঁ বলতে দ্বিধা করিনি। তারপর হাওয়ার রাত।

কবিদম্পতির কন্যা, 'ভালো-বাসা'-য় লালিত নবনীতা পারিবারিক সূত্রেই বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করছেন। তার সঙ্গে স্বকীয় মেধা ও মননে তিনি অনন্য বাঙালি লেখক। বাংলার রুচিশীল জনপ্রিয় সাহিত্যের অন্যতম আইকন। বাংলা সাহিত্যের যে-সুবর্ণধারায় লেখক অবলীলায় প্রবেশ করেন সাহিত্যের প্রায় সবগুলি সম্ভাব্য প্রকরণে, নবনীতার সে-পথে অবাধ যাতায়াত। কবিতা দিয়ে যে-পথচলার শুরু তা ক্রমশ কথাসাহিত্য, নাটক, অনুবাদ, ভ্রমণসাহিত্য, প্রবন্ধ, এমনকী আধুনিক প্রজন্মের কাছে দ্রুতবিস্তারী কলামেও সমান স্বচ্ছন্দ তিনি।

নবনীতাদির সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের নয়। সুবীর রায়চৌধুরীকে নিয়ে আমরা যে-কাজটা করছিলাম তখন, তারই প্রয়োজনে প্রথমবার ফোন করেছিলাম তাঁকে। লেখক নবনীতা দেব সেনকে তো চিনি শৈশব থেকেই। 'শুকতারা', 'আনন্দমেলা'-য় কি পড়িনি তাঁকে? কিংবা আরেকটু বড়ো হয়ে আলোচনায় মাতিনি 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে' বা 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে' কিংবা 'দেশ' পত্রিকার পাতায় সদ্য-পড়া নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর বড়ো লেখাটির বিষয়ে! তবে নবনীতা দেব সেনকে প্রথম জানতে শুরু করলাম, যেদিন শেয়ালদা ফ্লাইওভারের পাশে হাবিজাবি একগাদা বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি পত্রিকার ফাঁক থেকে খানচারেক 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা আবিষ্কার করলাম। চমৎকার শক্ত মলাটে বাঁধিয়ে রাখা, কোনো প্রয়াত গ্রন্থরসিকের আদরের ধন, নামমাত্র দামে বগলদাবা করে দক্ষিণমুখো লোকাল ট্রেনে দুপুর-দুপুর চলে এসেছিলাম আমার তখনকার আস্তানায়। সে প্রায় উনিশ-কুড়ি বছর আগেকার কথা। সেই সব সাহিত্যসংখ্যারই একটিতে (১৩৮৭) ছিল নবনীতা দেব সেনের বিখ্যাত আত্মকথা 'প্রথম প্রত্যয়'। তাঁরই প্রথম কবিতার বইয়ের নামের প্রতিধ্বনি। এই লেখার একটা জায়গায় এসে প্রথম একটু-একটু বুঝতে শিখলাম সাধারণ লিখিয়ে আর সত্যিকারের লেখকের মনোভঙ্গির তফাত। নবনীতা লিখছেন :

> এটা ঠিকই, জীবনে আমার যা কিছু প্রাপ্তি, সবেতেই একটা চরম ব্যাপার থেকে যায়। কিন্তু শিল্পে? শিল্পেও কি তাই? হাসিহাসি চোখটা দিয়ে লিখি খোশগল্প। দুঃখী চোখটা তাকিয়ে থাকে কেবল ভিতর পানে, কবিতা লেখে। আর, দুটো চোখ সমান করে ভিতর বাইরে পাশাপাশি মেলে রেখে লিখি প্রবন্ধ, উপন্যাস।

স্বীকারোক্তির সমান্তরালে এমন স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি আর লেখকের চর্চিত প্রতিমাকে বারংবার আঘাত করার মতো লেখা তার আগে কখনো পড়িনি।

এই লেখা পড়তে পড়তে বুঝতে অসুবিধা হয় না নবনীতা দেব সেন জানেন লেখক নবনীতা দেব সেনের গদ্য রচনা ও কবিতা লেখার তুল্যমূল্য সংখ্যা-বিচারে গদ্য এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। পাঠক খেয়াল করছে তাঁর এই মাধ্যম পালটে এগিয়ে যাওয়া। নবনীতা লিখেছেন :

> গদ্য লিখছি বলে কবিতা কম লেখা হচ্ছে? কি জানি। গদ্য লিখতে আমার প্রচণ্ড পরিশ্রম হয় ঠিকই, কেননা লেখার ধরনটা কবিতার কাছেই শেখা। বারবার কাটি, বারবার বারবার টুকি, বারবার লিখি। কিছুতেই যেন আশ মেটে না।...
>
> ...কবিতায় মানুষ তো তাই লিখবে, যা গদ্যে কিছুতেই লেখা যায় না? যা গদ্যেও লেখা সম্ভব, তা গদ্যেই বেশি গুছিয়ে লেখা সম্ভব, এ আমার বিশ্বাস। কবিতায় ফুটবে কেবল সেই অধরা মাধুরী, যা গদ্যে ধরা দেয় না। যা অনিবার্য ভাবে, বিশুদ্ধ ভাবেই কবিতার।

> বিভিন্ন মাধ্যমে লিখলে নিজেকে পূর্ণতর ভাবে ধরা যায়। কবিতাকেই সর্বত্রগামী হতে হবে, আমি তা মনে করি না। কেবল বিচিত্র পথে গেলেই হল। ফর্মুলায় বদ্ধ হয়ে যেন পড়ে না কবিতা। ... বিচার-বুদ্ধিতে সর্বতো ভাবে উপলব্ধ হলেও, যে সত্য তত্ত্বমাত্র, পরোক্ষ, বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা, তা নিয়ে আমি উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখতে পারি। কবিতা লিখতে পারি না। যা প্রত্যক্ষ রক্তের ভিতর থেকে উঠে আসছে, যা নিজের জীবনের মূল্যে কিনেছি, কেবল তাই নিয়ে কবিতা। এটা সবার ক্ষেত্রে সত্য না হতে পারে, আমার কাছে সত্য।

বস্তুত এখান থেকেই শুরু হওয়া উচিত তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান খোঁজার কাজ। কবিতার ভাষা তাঁর কাছে সংকেত। এক বন্য ঘোড়া। তাকে পোষ মানিয়ে জ্বলন্ত আগুনের রিংয়ের মধ্যে দিয়ে বাজনার তালে তালে লাফ দেওয়ানোই তাঁর কাছে কবিতা। একথা বোঝাই যায় একদিন যে-কিশোরীর খাতা থেকে কয়েকটি লেখা খুঁজে নিয়ে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় ছেপেছিলেন, যাঁর তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের প্রথম ছাত্রী হবেন নবনীতা, তাঁর সুচারু কাব্যভাবনার প্রভাব সারাজীবন বুকে লালন করেছেন নবনীতা। নিজের কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন 'আমার কোনো কাব্যাদর্শ নেই। প্রণবেন্দুর (দাশগুপ্ত) যেমন ছিল রিলকে। প্রণবেন্দু বলত কবিতার দ্বারা মহৎ কিছু সাধিত হয়'। আমাদের ধারণা নবনীতার মতোই বুদ্ধদেব বসু-ও বিশ্বাস করতেন কবিতা শুধু সাধন নয় যাপনও। অবশ্য কবিতা নিয়ে যত চমৎকার ভাবনাই থাকুক না কেন, একথা সত্যি যে কবি নবনীতাকে বাংলার পাঠক কমই পেয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের হদিশ নিতে গেলে সেটা আরও বেশি চোখে পড়ে। মোট কাব্যগ্রন্থ তিনখানি— 'প্রথম প্রত্যয়ে'র বারো বছর পর কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৭১-এ 'স্বাগত দেবদূত' আর আটত্রিশ বছর পর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'তুমি মনস্থির করো'। অবশ্য বেশ কিছু অগ্রন্থিত কবিতা নিয়ে ১৯৮৯-এ প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। গত শতাব্দীর আট-নয়ের দশক থেকেই নবনীতা বাংলা সাহিত্যের অগ্রগণ্য লেখক। তাই তাঁর কবিতার বই প্রকাশিত না হওয়ার তেমন কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবহারিক কারণ নেই। কিন্তু নবনীতা নিজেও খুব আগ্রহী হয়েছেন বলেও মনে হয় না। একেবারে শেষের দিকে তাঁকে প্রশ্ন করলে বলতেন, বই না বেরুনোর মূল কারণ না কি তাঁর আলস্য। তবে এটা গদ্যকারের উদাসীনতা নয় বলাই বাহুল্য। নিজের কবিতা নিয়ে বেশ প্রত্যয়ী ছিলেন তিনি। গত শীতের এক দুপুরে যখন বেছে দিতে বললেন তাঁর পাঁচ-ছটা কবিতা, যেগুলো সেদিন বাংলা আকাদেমির কোনো সভায় পাঠ করবেন তিনি, তখন কবিতা নিয়ে নানান কথা উঠে আসছিল। সেদিন জিজ্ঞেস করব-করব করেও করা হয়নি। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের যে পরম্পরা আছে বাংলা ভাষায়, তাতে এই প্রায় চায় দশকের বিরতি একটি অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। আজ মনে হচ্ছে, এর পিছনে নবনীতা দেব সেনের সুচিন্তিত কোনো ভাবনা থাকাও অসম্ভব নয়।

মূলত গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে যাঁরা বাংলায় লেখালেখি শুরু করেছিলেন তাঁদের কুল-লক্ষণ সাহিত্যে এক ধরনের আত্মজৈবনিক উপাদান নিয়ে আসা। কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলায় এক নতুন সম্ভাবনা খুলে যায় সেসময়ে। মনে রাখতে চাই নবনীতার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় ১৯৫৯-এ। পরবর্তী কয়েক দশক যাঁরা হয়ে উঠবেন অন্যতম প্রধান লেখক সেটাই ছিল তাঁদের নিজস্ব ভাষা খুঁজে নেবার, দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে বের করার প্রহর। এর ঠিক পরে পরেই নবনীতার জীবন তাঁকে সাময়িকভাবে টেনে নিয়ে যায় দূর প্রবাসে। কিন্তু যখন ফের তিনি অবতীর্ণ হলেন বাংলা ভাষার নিকোনো উঠোনে, ততদিনে তিনি পুরোদস্তুর লেখক। প্রথম পদক্ষেপের ঈষৎ অনিশ্চয়তাও নেই তাঁর কলমে।

১৯৭৬-এ যখন জীবনের একটা জটিল সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন নবনীতা, কলকাতায় ফিরে এসে গদ্যেই ফের আত্মপ্রকাশ তাঁর। এর আগেই কিন্তু দুনিয়াজোড়া মৌখিক মহাকাব্যের ভাষাতাত্ত্বিক বয়ন ও বিষয়গত মিল নিয়ে তাঁর গবেষণা চলছিল পুরোদমে। ১৯৬০-৬১-তেই মিলম্যান প্যারি-এ. বি. লর্ডের পদ্ধতি প্রয়োগে বাল্মীকি রামায়ণ নিয়ে কাজে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কলকাতায় ফিরে সে-কাজ যেন চিরতরে ছেড়ে দিলেন। 'যেন' বললাম কারণ আমাদের ধারণা নবনীতা ওই প্রকরণে গবেষণা না করলেও মহাকাব্যে, মৌখিক পরম্পরা, মহাকাব্যের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা আদৌ ছেড়ে আসেননি তিনি। তাঁর লেখায় সে-সব এসেছে বহুবার বহুভাবে।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আমি, অনুপম' (১৯৭৮) বাংলা ভাষায় একটি অনন্য সৃষ্টি। সূক্ষ্মতা আর নিবিড় এক সংবেদন তাঁর লেখার বড়ো সম্পদ যেমন, তেমনি বলিষ্ঠ ভাবনা তাঁকে সহজেই আলাদা করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সশস্ত্র রাজনীতির কুটিল সময়ে লেখা 'আমি, অনুপম' শুধুমাত্র অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচনের কারণেই অবিস্মরণীয় নয়, সেই সঙ্গে সাহিত্যের সততার জন্যও আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। রক্তাক্ত সময়কে এতটাই অনুপুঙ্খে দেখানো হয়েছে। কুটিল সেই দশকে ছদ্ম-বুদ্ধিজীবীর এক প্রতিনিধির সাপেক্ষে তিনি করতলের রেখার মতো চিনিয়েছেন আমাদের আপতিক সুসামাজিকতাকে, ছিন্নভিন্ন করেছেন সুখী গৃহকোণের প্রাচীন কিংবদন্তি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অস্বস্তিকর জীবনসত্যের

মুখোমুখি। বিদ্ধ করে ছেড়েছেন পাঠককেও। তবে তাঁর লেখায় একধরনের উত্তরণও থাকে যা নির্বিকল্প হতাশায় পর্যবসিত হতে দেয় না যাবতীয় ভাবনাকে, কোথায় যেন একটা আলোর রুপোলি রেখাও পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। 'আমি, অনুপম', 'প্রবাসে দৈবের বশে' (১৯৮৫) আর 'ফিনিক্স' (২০১১) এক অর্থে নকশাল ট্রিলজি, তাঁর সমসময়ের মনস্তাত্ত্বিক দলিল। আবার বাংলা উপন্যাসের আধুনিক যুগের এই সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন নবনীতার 'শীত সাহসিক হেমন্তলোক' (১৯৮৮), 'বামা-বোধিনী' (১৯৯৭) আর 'মায়া রয়ে গেল' (২০০১)-র মতো উপন্যাসের খোঁজ পড়া উচিত বলেই মনে হয়। 'শীত সাহসিক হেমন্তলোক' যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালির গত তিরিশ-চল্লিশ বছরের এক সংকট নিয়ে এগিয়েছে। সাংসারিক একাকীত্ব। যত টুকরো হয়েছে বাঙালির পরিবার, একান্নবর্তী শব্দ থেকে যত দূরবর্তী হয়েছে আমাদের পারিবারিক জীবন, তত স্বজনশূন্য ও একার জীবন কীভাবে আমাদের গ্রাস করেছে তা-ই এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'মায়া রয়ে গেল'-তে আবার অন্য নিরীক্ষা। যৌথ পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির অবলুপ্তির জন্য আমরা যতই সংকটের মুখোমুখি হই না কেন সে-পারিবারিক পরিসর কিন্তু বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে একেবারে স্বর্গের সিঁড়ি ছিল এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বস্তুত এই ভালো-মন্দ, সাদা-কালোর মতো জীবন যে স্রেফ কতগুলো বাইনারির সমষ্টি নয়, তা বোঝার মতো আধুনিক মন ছিল নবনীতা দেব সেনের। পুরুষ তার নিজস্ব নীল নকশায় মেয়েদের জন্য যেসব খাঁচা নির্মাণ করেছে বা প্রতিনিয়ত করে চলে যৌথ পরিবার তার থেকে মুক্ত কোনো পরিসর নয়। এই উপন্যাসে সুষমা যেমন অনুভব করেছে, বা আমাদের সমাজের অনেক সুষমাকেই যার মুখোমুখি হতে হয়। উপন্যাসের সুষমা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি, উপায়হীন মেয়েদের জন্যে কাজে ক্রমেই জড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে।

নবনীতার প্রথম যৌবনের আগ্রহ মহাকাব্যের, বিশেষ করে রামায়ণের মৌখিক পরম্পরা, লোক ঐতিহ্যের সংলগ্ন ভাবনা ফুটে উঠেছে 'বামা-বোধিনী'-তে। রামায়ণের পুরুষতান্ত্রিক টেক্সট ও চিন্তাপদ্ধতিকে নবনীতা চ্যালেঞ্জ করে আসছিলেন অনেক দিন ধরেই। এই উপন্যাসে সম্ভবত সেই ভাবনারই গদ্য-কুসুম। আর সচরাচর নবনীতা যা করেন না, এই উপন্যাসে একটি 'ভণিতা' জুড়ে দিয়েছেন। সেই 'ভণিতা' আবার প্রকাশতথ্য জাতীয় নয়। তাতে নবনীতা লিখছেন :

> এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং নির্মাণপদ্ধতি দুটিই পরস্পর নির্ভর, পরস্পরসম্পৃক্ত। কাঠামো এখানে বক্তব্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ। সচরাচর বাংলা উপন্যাস যেভাবে লিখিত হয়, এটি সেভাবে লেখা হয়নি, এর গড়নপেটন আলাদা, চলনবলনও একটু অভ্যস্ত পরিধির বাইরে। জীবনের অনেকগুলি বাস্তব জটিলতাকে এখানে গভীরে ছুঁতে চেষ্টা করেছি। সমাধানের দায়িত্ব হয়তো নিতে পারিনি। তবু সমস্যাকে অনেক সময় ঠিকঠাক চিনতে পারলে, তার মীমাংসা সরল হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময়ে আমরা চোখ বুজে থাকতে চাই। অনেক সময়ে আয়নাটাও তো কাজে দেয়।...

উপন্যাসের নায়িকা অংশুমালা রামায়ণের সীতাকাহিনি সংকলন-সংগ্রহের কাজ করে। বস্তুত 'বামা-বোধিনী'র পাঠ তখনই সম্পূর্ণ হবে যদি তাকে নবনীতার 'চন্দ্র-মল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ' বইটির সঙ্গে বা মেয়েদের লেখায়-কথকতায় রামায়ণের টেক্সট নিয়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলো মিলিয়ে পড়তে পারা যায়। অংশুমালার কাছে সবথেকে জরুরি হয়ে ওঠে বাংলার মেয়ে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ। আধুনিক পাঠকেরা যাকে হয়তো সীতায়ন গড়ে তোলার প্রকল্প হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারেন। এই চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মান্য ইতিহাসকারদের কাছে অচ্ছুতই থেকে গেছে। নবনীতার মতে এটি অনেক বেশি মৌলিক গুণসম্পন্ন রচনা কিন্তু সাহিত্যেতিহাসকারদের কেউ একে বলে দুর্বল, কোনো গবেষক বলেন অসম্পূর্ণ। সুকুমার সেন চন্দ্রাবতী প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তাতে নবনীতা তাঁর নাম উল্লেখ করেই ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তারপরই তুলে দিয়েছেন সেই জরুরি প্রশ্ন যে, একে 'সাইলেন্সিং'-য়ের কৌশল রূপে চিহ্নিত করা যায় কি না। আমরাও অবাক হয়ে খেয়াল করি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মান্য-বয়ান অদ্ভুত নীরবতা পালন করে। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রামকথার অন্তরালে সীতা-কথা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়নের বাইরে গিয়ে নারীর চোখে মহাকাব্য। অংশুমালাও এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। ফলে তাকেও একইরকম বিরুদ্ধতার মুখোমুখি পড়তে হয় যেমন পড়েছেন নবনীতাও। সে-বিরুদ্ধতা শুধু পুরুষের নয়। মেয়েরাও সামিল তাতে। নবনীতা 'রামায়ণবিষবৃক্ষম্' প্রবন্ধে শুনিয়েছেন সেরকম একটি কথা :

> সন্ধ্যাবেলায় আমি আমার এক তেলুগুভাষিণী বান্ধবীর বাড়িতে বসে দু-জনে মিলে একটি বই পড়ছিলাম। এমন সময়ে বান্ধবীর বয়স্কা প্রতিবেশিনী এলেন, 'বাবাঃ, এত কড়া নাড়ছি শুনতেই পাচ্ছো না, কী বই পড়ছো তোমরা এত মন দিয়ে? দেখি দেখি? বইটা দেখাতেই শিহরিত হলেন। 'ছিছিছি! এ যে নোংরা বই। ফেলে দাও, ফেলে দাও। এতে সংসারের অকল্যাণ হবে। অ, বুঝেছি, এই জন্যে তোমার স্বামীর ম্যালেরিয়া অমন ঘুরে ঘুরে হচ্ছে। এ ছাই-বই বাড়িতে ঢুকতে দেয় কেউ?— বলে আমার

> দিকে কটমট করে তাকালেন। যেন আমিই কুকীর্তির পাণ্ডা।

'বামা-বোধিনী' তাঁর লেখাগুলির মধ্যে প্রায় বাতিঘর-তুল্য।

নবনীতার সাহিত্যের যে-দিকটা নিয়ে সব থেকে কম আলোচনা হয় তা হল প্রবন্ধ। এমনিতেই বাংলার সজল আবহাওয়ার কারণে কি না জানি না, বাংলা প্রবন্ধ প্রায়ই পেলব একটা আকার পায়। কিন্তু মূলত কবিতা ও কথাসাহিত্যের লেখক হয়েও নবনীতার প্রবন্ধগুলির তুল্য পোলেমিক, শানিত রচনা খুব বেশি পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। তাতে বহুপঠনের অভ্যেস, বোধ ও ভাষার সঠিক ভারসাম্য যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর বিশ্বাসের জোর। তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য' পড়লে বোঝা যায় এমনকী চলতি হাওয়ার বিপরীত মুখে দাঁড়াবার ক্ষমতাও তিনি ধারণ করেন। কমলকুমার মজুমদারকে নিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন অবলোকনের সামনে পাঠককে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। 'পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক : এবং অথবা' প্রবন্ধটির কথা বলছি। নবনীতার মূল প্রতিপাদ্য ছিল কমলকুমারের তুল্য ঐশ্বর্যের অপচয় ও অপব্যবহার সম্ভবত গোটা দুনিয়াতেই বিরল। আর একথা নানান যুক্তি পরম্পরায় সাজাতে গিয়ে তাঁর বহু আপত্তির একটা ছিল সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের সংলগ্নতার প্রশ্নে। সাহিত্য শব্দটার বুকের মাঝে 'সহিত' কথাটা যে আছে তা ভুলতে নারাজ তিনি।

আসলে তিনি নিজের ক্ষেত্রেও জীবন আর সাহিত্যের মধ্যে নেই কোনো বিসংবাদী দেওয়াল। নবনীতা দেব সেনের অনেক লেখাতেই প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি আছেন অন্যতম প্রধান চরিত্র হয়ে। নিজের জীবনের স্মিত ও প্রলম্বিত এক আখ্যান-ডোরে পাঠক তখন তাঁর জীবনে যেন বাইরে থেকে উঁকি মারার জন্য স্থায়ী আমন্ত্রণ-প্রাপ্ত। তাঁর ছোটোগল্প ও ভ্রমণের লেখাগুলি সর্বাঙ্গে নবনীতাময়। তাঁর কলমে ভ্রমণসাহিত্যের স্বাদ মাতোয়ারা করে ছাড়ে স্বভাব-অলস পাঠককেও। এও তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন। পায়ের তলায় সর্ষের বাংলা প্রবাদ আক্ষরিক অর্থেই সত্য হয়েছে তাঁর জীবনে। কোথায় না-কোথায় গিয়েছেন এবং কত বিচিত্র সব মুহূর্তের জন্ম দিয়েছেন। কলমের নিপুণ আঁচড়ে নির্মিত হয়েছে এক একটা চমৎকার ছবি, যা আমাদের ভ্রমণ-নির্ভর লেখালেখির আনুষ্ঠানিকতার মোড়ককে এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের দুই বিরল লেখক লীলা মজুমদার আর আশাপূর্ণা দেবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর। যখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করত বাংলা ভাষার প্রিয় লেখকের নাম, তখন নবনীতার প্রথমেই মনে পড়ত আশাপূর্ণা দেবী আর লীলা মজুমদারের নাম। এমনকী এও লিখেছেন :

> আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন আমার লেখার স্টাইলের ওপরে কোনো প্রিয় লেখকের প্রভাব আছে কি না, আমি বলব সোজাসুজি প্রভাব হয়তো নয় কিন্তু গভীর অনুপ্রেরণা আছে। আমার নিজের পরিবারকে নিয়ে লেখা মজার গল্পের মধ্যে আপনার [লীলা মজুমদার], আর কৌতুকের সঙ্গে পুরাণের পুনঃকথনের মধ্যে পরশুরামের, একনিষ্ঠ পাঠকের ছায়া আমি দেখতে পাই।
>
> [শ্রীচরণেষু লীলা মাসিমা/স্বজনসকাশে]

এ সেই উত্তরাধিকারের সূত্র যা আধুনিকতার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে এমন একাত্মবোধ আর নিজের সময় সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি তাঁকে অনন্য করেছে। আমাদের ভুলে যাবার কথা নয় একটি পত্রিকার সাপ্তাহিক জনপ্রিয় কলামে তাঁর একের পর এক সংবেদী রচনা, যা গত এক দশকেরও বেশি পাঠককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নবনীতার সে লেখাও মূলত প্রসন্ন জীবনবোধ নিয়ে জীবনকেই ছুঁয়ে দেখা। জীবনকে এত কাছ থেকে একই সঙ্গে আবেগভরা ও যুক্তির নিরিখে দেখা, নিজেকে নিয়েই ক্রমাগত ঠাট্টা করে যাওয়া, জীবন সম্পর্কে একটা পরিপূর্ণতার বোধ তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। অপ্রাপ্তি, প্রত্যাখ্যান, অবমাননা ছাপিয়ে জীবনকে ভালোবেসে যাওয়া আর স্বপ্নতাড়িতের মতো লিখে যাওয়া— 'বুকের ভেতর বুকজোড়া মাঠ/চোখের ভেতরে চোখজোড়া চাঁদ/নখাগ্রে নক্ষত্ররাজি।' এই আমাদের নবনীতা দেব সেন।

গৌরী বসু— বিস্মৃত এক নাম

নূপুর সেনগুপ্ত

আমার সংগীত গুরু, আরো একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আমাদের গৌরী মামীমা (সাহিত্যিক সমরেশ বসু পরিচয়ে আমাদের মামা)। প্রথম যেদিন সাহস সঞ্চয় করে গৌরী মামীমার কাছে গিয়েছিলাম, মনে পড়ে আমার পরম বন্ধু সাহানা দাশগুপ্ত আমার সঙ্গী হয়েছিল। খুবই কম বয়স। স্কুলে পড়ি নীচের দিকেই। সাহানা তখনই অসাধারণ কণ্ঠের অধিকার অর্জন করে ফেলেছিল কোনো যাদুবলে। বিস্ময় বৈকি! রবীন্দ্রসংগীতের জগতে অনাবিল দখল। অবাক করা পরিবেশন। গৌরী বসুর কথা শুনে ও এককথায় রাজি। এক ছুটির সকালে আমরা দুজনে চললাম সমরেশ বসুর বাড়ি অভিমুখে। নৈহাটি স্টেশনের কাছে বাড়ি। সাহানা বেশ ভয়ে ভয়ে চলল। আমি সাহসী। কারণ মনে মনে জানি সাহানার গান যদি গৌরী মামীমা শোনেন তাহলে আর ভয় নেই। আমাকে তো আর গাইতে হবে না। সাহানাকে উপহার দিয়ে ওঁকে খুশি করে দেব। দুজনে বাড়ির কাছে পৌঁছে অনেক সাহস সঞ্চয় করে প্রথম দরজাটি (gate) খুললাম। দরজার পরেই মনোরম একটি কামিনী ফুলের গাছ। ছাতার মতো করে ছাঁটা। ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। নীচে শান বাঁধানো উঠোনে কয়েকটি গোল বেতের চেয়ার। ইতস্তত রাখা। সেই যে প্রথম মুগ্ধতা, আজও স্বপ্নে দেখা দেয়। হয়তো কিছুই না, তবু যেন কত কিছু। প্রসঙ্গত বলি সাহিত্যিক সমরেশ বসুর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং একপ্রকার আত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে আমার যাওয়া হয়নি ওই মায়াময় বাড়িতে। শ্রদ্ধেয়া গৌরী বসু কয়েকবার আমাদের এবং আমার মামার বাড়িতে এসেছেন। আমি খুবই ছোটো তখন। কিছুই বুঝতাম না, কেবলই রবীন্দ্রসংগীত শুনতে দেখতাম মা এবং বাড়ির অন্যান্যদের চোখ বুজে, কিংবা অন্য দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তাই আমিও শুনতাম। আর ক্রমে এক মুগ্ধতার আকর্ষণ অনুভবে এসে যেত। শুনতে বসতাম বড়োদের সঙ্গে গৌরী মামীমার গান।

গৌরী বসুর সংগীত বিদ্যালয় এর নাম ছিল 'ফাল্গুনী'। সেই মায়াময় বাড়ি। কামিনী ফুল সুবাসিত উঠোন। বড়ো চওড়া সিঁড়ি কয়েকটি। উঠে গ্রিলের দরজা। ভিতরে প্রশস্ত ঘর। গৌরী বসু একটি চেয়ারে বসা। লাল পাড় সাদা শাড়ি পরনে, মুখে ভুবন ভোলানো হাসি। যেন কত পরিচিত আমরা। অথচ আমরা দুজনেই নিতান্ত ছোটো দুটি মেয়ে, এবং কিছুটা অসময়েই আমরা হাজির হয়েছি। সকাল এগারোটার পর, যখন স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর ব্যস্ততা থাকতে পারে। হাসিমাখা দৃষ্টি মেলে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভিতরে ডাকলেন। প্রণাম করলাম। স্নেহের হাত আমাদের দুজনেরই মাথায় রাখলেন এবং আমাদের অবাক করে নিজের হাতটিও নিজের কপালে ছোঁয়ালেন। আজও সেই দৃশ্য আমি ভুলিনি। আমাকে ভাবায় আজও গৌরী মামীমার এই অনাবিল ভালোলাগায় ভরা ব্যবহার এবং মুগ্ধ করা আচরণ। তাঁর সেই সৌম্যদর্শন অবয়বে যেন মিলে যেত সবকিছু নিখুঁত তন্ত্রীতে বাঁধা সুরে লয়ে। ঠিক তাঁর কণ্ঠের সংগীতের মতো। আমরা অভিভূত হয়েছি বার বার।

সেদিন খুব খুশি হলেন সাহানার গান শুনে। ছোটো মেয়ে মানুদি (মৌসুমী) ছিলেন কাছে। বললেন, 'মানু, ওদের ইলিশ মাছ ভাজা এনে দে'। কানে লেগে আছে সেই শব্দগুলি এখনও। আজ দীর্ঘকাল পরেও ভুলিনি মাছভাজার প্লেটটিকে। জানি না সাহানার মনে আছে কিনা। ওর সঙ্গে দেখা হলে জানতে চাইতাম। তারপর সাহানা গান ধরল খালি গলায়। প্রথমেই গেয়েছিল, 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে'। একইভাবে সেই ধ্রুবপদ আজও আমায় বেঁধে নিয়ে চলেছে। গৌরী বসুর স্মৃতি, তাঁর গান শেখানোর সুচারু দক্ষতা এবং অবশ্যই এক স্নেহময়ী পরশ। যেন মায়ের কাছে বসে রবীন্দ্রনাথের গান শিখছি।

গৌরী বসুর স্মৃতিতে নৈহাটির বিশিষ্ট মানুষদের লেখা থেকে উল্লেখ করতে গিয়ে, প্রথমেই মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরীর কথা। গৌরী বসুর মৃত্যুর পর একটি স্মরণিকা পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেখানে সত্যজিৎ চৌধুরী লিখেছিলেন— 'মানুষে মানুষে সম্পর্কের একটি স্তর একান্ত ব্যক্তিগত। সে স্তরটি নিখাদ। সামাজিক সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতায় খাদ কিছু না কিছু মেশেই। আমাদের জীবনযাপনের বেশিরভাগ পড়ে যায়

আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ঘেরের মধ্যে, সে ঘের পেরোনো যায় কদাচিৎ। যাদের সঙ্গে ওঠাবসা মেলামেশা নিয়ে জীবন, সকলেরই ব্যক্তিত্বে থাকে এক এক ধরনের আবরণ। আবরণ কি আমাতেও নেই। আবার কোথাও কোথাও সে আবরণ উভয়ত ভেঙে যায় অনায়াসে। কী করে যে ভাঙে, সে এক রহস্য। ইচ্ছে করলেই ভাঙা যায় না। কিন্তু ভাঙলে ভাঙে নিঃসাড়ে। সেতু বাঁধা হয়ে যায় দুই ব্যক্তিগতর মধ্যে। আমাদের অগোছালো, ছড়ানো-বিছানো সত্তার আয়তনে এরকম একটি দুটি সম্পর্কের গ্রন্থি আলোর সুতোয় রচিত। বড়ো শুদ্ধ অমল সে আলো। গৌরীদির কথায় এই রকম অনুভব জাগে।' এই লেখাটি বহুবার পড়েছি, পড়ি, পড়বও। বর্তমান সামাজিক পরিকাঠামোয় দাঁড়িয়ে এই মনস্কতার পরিচয় কেবলই পরিমিত নয়, বিরল বটে। এই যে মানুষটি ছিলেন, শ্রদ্ধেয়া গৌরী বসু, একটি অনুভব, স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, চেতনার অঙ্গনে সদা সক্রিয়, ভূমিকায় ব্যাপ্তি, ধারণায় দৃঢ় এবং কঠিন সংগ্রামে অভিযোগহীন এক সুদৃঢ় সম্মানীয় জীবনের অধিকারিণী, এমনটি বিরলই বলতে বাধ্য করে বৈকি।

নৈহাটি ছেড়ে চলে আসার সময় আমার অব্যক্ত বেদনা আরো অনেক কিছুর সঙ্গে গৌরী বসুর সান্নিধ্য বাতিল হওয়া ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। যখনই ফিরে গেছি, দেখা করতে যেতাম। সমানভাবে কাছে টেনে নেওয়া, সেই পুরোনো মমতা জড়ানো কত-ভূমিকা বার বার মুগ্ধ করেছে। অনুভব করতাম ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত এই মানুষটির মন। নিজেকে মেলে দিতে পেরেছিলেন অনেক দূর পর্যন্ত, যেখানে নিতান্তই সাধারণ একটি মানুষের ঠাঁই মেলে। ঘর বাহির তাঁর কাছে যেন একই সূত্রে হৃদয় আন্দোলিত করতে পারত। তাই সকলেরই একটি নিগূঢ় শ্রদ্ধা এবং মান্যতার অনুভব ছিল তাঁর প্রতি। যেকোনো সমস্যার কথা তাই বলা যেত তাঁকে, ওই 'আমায় কেন বলো নি'— এই অনুরণন কাজ করত যেন তাঁর অন্তরে। এইখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছা করে, আমার ছোটোমামার (প্রয়াত সাহিত্যিক অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত) লেখার অংশ, পরকে বুঝতে পারার বা অনুভব করার ক্ষমতার অন্য নাম বোধহয় সংস্কৃতি। সেই অর্থে গৌরী বউদির (গৌরী বসু) মতো পরকে বুঝতে পারার ক্ষমতা বা একাত্ম হয়ে কারও সুখ দুঃখ সমস্যাকে অনুভব করার মানসিকতা আমি খুব কমই দেখেছি। অশোকরঞ্জন লিখেছেন, 'নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের বোধ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন জীবন এইখানে, জীবন এইখানেই। এইভাবেই তাকে দেখতে হবে।'

গৌরী বসুর পিতা শ্রদ্ধেয় সংগীতাচার্য যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ঋজু বলিষ্ঠ চরিত্রের উদাত্ত রূপ, বিশিষ্ট পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। সন্তানদের মধ্যে প্রসারিত ছিল সেই সংগীত প্রতিভা। গৌরী ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর প্রতি সংগীতের প্রভাব ছিল কিয়দংশে বেশি। অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন গৌরী বসু। রবীন্দ্র, নজরুল, কীর্তন, ভজন সকল ঘরানার সংগীত তাঁর কণ্ঠে মধুরতা পেয়েছে বার বার। সমৃদ্ধ করেছে নৈহাটির মানুষকে। আমরা পেয়েছি নিবিড় শিক্ষার পরিবেশ। আজ এত বছর পরেও তাই ভুলিনি সেই শিক্ষা। মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান, "মধুর তোমার শেষ যে না পাই" শিখেছিলাম। প্রতিবার বলে দিয়েছিলেন, 'কোথায়' এবং 'অসীম' এই কথা দুটি একদমে বলতে হবে। হয়তো কিছুই না এইসময়ে, তবু আমার মনে পড়ে সেই আত্মমগ্ন শেখানোর ভঙ্গী এবং সাবলীল সুচারু পরিবেশ। প্রাচীন ঐতিহ্যের মায়াময়তায় সমৃদ্ধ হই অন্তরে।

প্রতিবছর 'ফাল্গুনী'-র বাৎসরিক উৎসব হত। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। অনুষ্ঠানের শিরোনাম থাকত, 'বসন্তোৎসব'। প্রতিবছর দুজন বিশিষ্ট শিল্পীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হত। ফলত, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বহু বিখ্যাত শিল্পীর গান শোনা হয়েছে। শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, উত্তরা দেবী, ইন্দুবালা দেবী, রাধারাণী দেবী, কালিপদ পাঠক, মায়া সেন, গীতা ঘটক, নীলিমা সেন প্রমুখ সকলের গান শোনা এবং স্বচক্ষে দেখার সুযোগ ঘটেছিল। 'ফাল্গুনী'-র অনুষ্ঠানে একটি সুপরিচালনার দৃঢ় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে চিরদিন। তাই 'ফাল্গুনী' একটি অহংকার নৈহাটির।

গৌরী বসুর জন্ম ১৯২০ সালে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার রজনী চাটুজ্জে রোডের বাড়িতে। খুব ছোটোবেলা থেকেই গানের গলা ছিল অদ্ভুত সুন্দর। পিতার কাছেই তাঁর প্রেরণা, উৎসাহ, সাহচর্য ও শিক্ষাধীনে দীর্ঘ সংগীত সাধনার পর্ব শুরু হয়। অল্প বয়সেই কীর্তন গানে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন পিতার সান্নিধ্যে। পরবর্তী কালে রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুবালা এবং সুবিনয় রায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। একসময় অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছেও সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আরো পরবর্তী কালে দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন।

গৌরী মামীমার কণ্ঠে প্রথম শুনি, 'জীবন নদীর ওপারে, এসে দাঁড়ায়ো বঁধু হে' এবং 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না'। তারপর 'ছুটি' সিনেমায় গান দুটি শুনি। অসাধারণ গাইতেন গান দুটি। আজও কানে বাজে। রবীন্দ্র নজরুল সব ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা ভাবায়, রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের গান, এবং অন্যান্য ধারার সংগীত, কীর্তন ভজন ইত্যাদি সকল গানেরই নিজস্ব একটি শৈলী বা ঢঙ থাকে। সবরকম গান চর্চায় কোন একটি

বিশেষ শৈলী কে আয়ত্ত করা যায় না জানি। অথচ গৌরী বসু যে গানই যখন গাইতেন, এই পার্থক্য পরিস্ফূট থেকেছে। এখানেই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধা জাগায় বার বার। রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্গের গানে মুগ্ধতা পেয়েছি বিশেষ করে। 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা', 'তবু মনে রেখো', 'স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে', 'ও চাঁদ চোখের জলে লাগল জোয়ার', 'না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে', 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছো' ইত্যাদি গানগুলি ওঁর কণ্ঠে যারা শোনেননি, তাঁরা জীবনে বিশেষ একটি পরম প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলতেই হবে।

অশেষ গুণের অধিকারিণী ছিলেন গৌরী বসু। অসাধারণ রান্না করতেন। এবং খাওয়াতে ভালোবাসতেন সকলকে। নিজে হাতে পরিবেশনও করেছেন দেখেছি। স্কুলের অথবা বাড়ির বহু অনুষ্ঠানে রান্না করে খাইয়েছেন। অপূর্ব সে সব রান্নার স্বাদ। গৌরী বসু কবিতা লিখেছেন। গান লিখেছেন। গল্প লিখেছেন। যদিও তাঁর সহজাত এই প্রতিভা নিভৃতেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর স্মরণিকা গ্রন্থে আমি পাই সেই প্রতিভার পরিচয়। এও এক পরম প্রাপ্তি। একটি দুটি কবিতার উল্লেখ করি—

'রাখী পূর্ণিমা'- গৌরী বসু

'বেঁধেছিনু তব হাতে সেই রাখী পূর্ণিমাতে
শ্যাম নব দুর্বাদল রাজি।
বাইশ বছর পরে ঝরাপাতা দ্বিপ্রহর
মনে পড়ে সেই কথা আজি।
গান গেয়ে পথ চলা আসিনু 'মাকাল তলা'
বেদীতে বসিনু মোরা দুটি
সামনে ছেলের দল ছেঁচিয়া খালের জল
মাছ ধরে কত চুনোপুঁটি।।
সময় চলিয়া যায় খেয়াল নাহিক তায়
বসে বসে দেখি দুইজনা,
মনে পড়ে স্বপ্ন রং ভাঙাগড়া অনুখন
সুখস্বপ্নে দোঁহে আনমনা।।
এসব পুরান কথা স্মরণে হৃদয়ে ব্যথা
বড় বাজে তবু নাহি ছাড়ে।'

গৌরী বসুর আরো একটি কবিতা....

'নিষ্ঠা'

'এ বিচিত্র জগতে কেন মরি ভালোবাসা খুঁজে?
ও সব রঙীন নেশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পুজে -
দেখি তার চেয়ে নীরবে মন প্রাণ দিয়ে -
কোন শক্তি বা কর্মে লিপ্ত হলে
এ সবের উর্দ্ধে চলে যায় মন -
নিষ্ঠার সঙ্গে করি তারই অনুগমন।।'

নিজের জীবনকে নিজ শক্তিতে নিজ অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে কীভাবে রচিত করে তুলতে হয়, গৌরী বসু তার এক অসীম উদাহরণ দিয়ে গেছেন সমাজকে। সেখানে ছিল না কোনো দৈন্য, ছিল না কোনো অহংকারের আবরণ। ছিল না কোনো অভিযোগ অথবা ক্লান্তি। ছিল কেবলই হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা। ছিলেন সম্পূর্ণভাবে নিজ প্রচার বিমুখ। কেবলই যেন আপন সাধনায় প্রণত। অনুকরণীয় একটি আদর্শ, অবশ্যই জীবনদর্শন। নৈহাটির অহংকার, আমাদের অহংকার গৌরী বসুর প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয় বৈকী অন্তর।

চিঠির বাক্সো

নিখিলেশবাবুকে অনেক ধন্যবাদ যে তিনি আমার প্রবন্ধ (*আরেকরকম* বিশেষ সংখ্যা অক্টোবর ২০১৯) মন দিয়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনি প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠা (পৃ. ৭৭)-তে বলা কথাগুলো ভুলে গিয়ে বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের কথা (পৃ. ৭৯) থেকে পরের পৃষ্ঠাগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠাতে পরিষ্কার বলেছিলাম যে লোকবাদ নিয়ে যা আলোচনা হবে তা প্রধানত আর্নেস্তো লাকলাউয়ের বইয়ের ভিত্তিতে হবে। তাই লোকবাদ নিয়ে আমি ওই প্রবন্ধে নিজের কোনো মনগড়া সংজ্ঞা ও তত্ত্ব পেশ করিনি। বরং লাকলাউ-এর কথা অনুসারে বলা হয়েছিল 'লোকবাদ কোনো বিশেষ আন্দোলন বা আবেগ অথবা মতাদর্শ নয়। লোকবাদী দল ও সরকারের পিছনে কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণির সমর্থন থাকে না। লোকবাদ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটা বৃহত্তর জনসমাবেশ গঠন করা সম্ভব' (পৃ. ৭৭)। লোকবাদ ও জনপ্রিয়তাবাদ নিয়ে সচরাচর সংবাদমাধ্যম ও উদারপন্থী একাডেমিকরা অনেকে মনে করেন যে তা মার্কসবাদ, উদারবাদ, ফ্যাসিবাদ, নারীবাদ জাতীয় আরো কোনো একটি রাজনৈতিক মতবাদ বা কোনো একটি বিশেষ রাজনীতি। সেই ধারণা লাকলাউয়ের মতে ভুল। তাই লাকলাউয়ের তত্ত্ব অনুযায়ী লোকবাদ একটি সার্বজনীন ও সার্বিক (ইউনিভার্সাল) তত্ত্ব। কোনো বিশেষ (পার্টিকুলার) তত্ত্ব নয়। জয় পরাজয় ব্যতিরেকে লোকবাদ হবে কারণ তা ছাড়া রাজনীতি চলবে না। তাই বামফ্রন্ট হারা মানে বামফ্রন্ট লোকবাদ করেনি তা বলা যাবে না। লোকবাদ ছাড়া বামফ্রন্ট ২০১১ বা ২০১৬ বিধানসভা এমনকী ২০১৯ লোকসভায় তো বেশ কিছু ভোট পেয়েছিল কিংবা ছোটো বড়ো জনসমাবেশ করেছিল। এই প্রক্রিয়া যেকোনো বড়ো দলের ক্ষেত্রেই হবে তা তৃণমূল হোক বা বিজেপি, কংগ্রেস। কিন্তু কোনো দলই শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী ও শ্রেণির সমর্থন জোগাড় করতে পারে না। আবার একটি শ্রেণি ও গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে কোনো একটি দলকে সমর্থন করে না যদিও সংবাদমাধ্যমে এই অতি সরলীকরণের একটা প্রবণতা থাকে। কিছু একাডেমিক আলোচনাতেও তাই হয়। বড়ো জনসমাবেশ করতে গেলে কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ হারে ভোট পেতে গেলে জনসংখ্যার অনেকগুলো অংশকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে হয়। সেই রাজনীতি সফল না অসফল তা বিচার্য নয়। আশা করি নিখিলেশবাবু তাঁর প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন।

মইদুল ইসলাম
কলকাতা

২

অযোধ্যার রামমন্দির-বাবরি মসজিদ বিষয়ে শীর্ষ আদালতের রায় নিয়ে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তবু একটা/দুটো কথা যোগ করতে চাই।

অযোধ্যার মন্দির-মসজিদ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজতে গিয়েই যে মহামান্য শীর্ষ আদালত বিষয়টির উপর রায় ঘোষণা করেছে তা সহজেই বোঝা যায়। রাম একজন মহাকাব্যের নায়ক। তিনি দেবতা বা ঈশ্বর নন, যেমন নন মহাভারতের কৃষ্ণ। আসলে হিন্দুরা তাঁদের ঈশ্বর খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে—অবয়বহীন ব্রহ্মের ধারণা নিয়ে চলে না ব'লে— এই পৌরাণিক চরিত্রদের ঈশ্বর বানিয়েছেন। আসলে ঈশ্বর যে মানুষেরই সৃষ্টি সে-কথা বিশ্বাস করার লোক এই প্রাচ্য বিশ্বে খুঁজে পাওয়া কঠিন, যদিও যুক্তিবাদীদের ক্ষীণ একটা আন্দোলনও পাশাপাশি রয়েছে সর্বত্র। এমনকি মুসলিমবিশ্বেও।

যে সমাধানের চেষ্টা ইলাহাবাদ হাইকোর্ট করেছিল তারই

অন্যতর একটা রূপ বর্তমান রায়ে এল। হতে পারে, মন্দিরের উপরেই মসজিদ উঠেছে মুসলমান শাসকদের আমলে। তবু সে প্রশ্ন তোলা এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়। তবে হিন্দুদের আবেগও বুঝে নিতে হয় পাশাপাশি, যে আবেগ— যা অবশ্য অন্ধবিশ্বাসনির্ভর— থেকে তারা মনে করে অযোধ্যা রামের জন্মভূমি। রাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি না হলেও স্থান হিসেবে অযোধ্যা রামায়ণের কালে যেমন ছিল তেমন আজও সত্য। সরযূ নদী সত্য। ফলে হিন্দুদের আবেগকে অস্বীকার করা কঠিন।

কিন্তু শীর্ষ আদালত তাদের আদেশে সরকারকে যে রামমন্দির তৈরি করার ভার দিলেন তা স্পষ্টতই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রধারণার বিরোধী। ধর্মনিরপেক্ষতাই ভারতরাষ্ট্রের সব থেকে বড়ো মানবিকতার পরিসর রচনা করেছে, সব থেকে বড়ো গর্বের জায়গা নিয়ে আছে। সেইখানে কার্যত আঘাত এসে লাগল। এটাই আমাদের বিবেচনায় সব থেকে বড়ো বেদনার জায়গা। জানি না ভারতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কোন দিকে।

সত্যসাধন বিশ্বাস
কলকাতা

৩

১৫-৩০ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত সুলেখা অধিকারী লিখিত প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে লেখা ও অভিজ্ঞতার গুণে সুপাঠ্য। জলের অপর নাম জীবন, সেই জ্ঞান হওয়া অবধি শ্লোগানের মতো শুনে আসছি। আসলে সবাই জানি অথচ কেয়ার করছি না। এর ফল অচিরেই পাবেন জনগণ। সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ মারফৎ জানা গেল 'ডায়নামিক গ্রাউন্ড ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে 'সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড'। এই সূত্রে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর বক্তব্য, দেশের ভূ-গর্ভস্থ জলের ২২ শতাংশ শুকিয়ে গেছে নয়তো অধিক ব্যবহার হয়েছে। যার পরিণাম ভয়ংকর। চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুর সাম্প্রতিক জল সংকট তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে (সূত্র: *এই সময়*)। *আরেক রকম* পত্রিকার সুধী পাঠকদের যা জানার তা জানা হয়ে গেছে, কীভাবে কতভাবে আমরা জলের অপচয় করি।

উপাসক কর্মকার
বিরাটি

পুনঃপাঠ

ধর্মতলায় কর্ম খালি

নবনীতা দেব সেন

আজ ৩০ সেপ্টেম্বর। সকাল থেকে আমার অস্থির লাগছে। নন্দনাকে আজকেই মুম্বই ফিরে যেতে হবে দুপুরের ফ্লাইটে। দু-ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে চলে এসেছি। কাল অনেক রাত্রি অবধি চেষ্টা করা হয়েছিল যদি ওর যাওয়াটা একদিন পিছনো যায়, কিন্তু সম্ভব হল না। নন্দনাটা মুম্বই পৌঁছবে সাড়ে চারটে, তখন কী হয় কী হয়। সারা দেশ জুড়ে অস্বস্তি, চাপা ভয়, অবিশ্বাসের বাতাস বইছে। বিকেলের সই-এর আসরে দূরের সই-রা আসবেন না বলেছেন, ফেরার অসুবিধে হতে পারে। যানবাহনের, নিরাপত্তার, নানা ভাবনা। উদ্বেগের অশ্রুত বেহালার ছড় হাওয়ায় শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিনা মেয়েটা মুম্বই চলল। নন্দনার এক বন্ধুকে ফোন করে দিই, সাড়ে চারটেয় নন্দনা পৌঁছচ্ছে। সে নিজেই বললে, ভাবনা নেই, আমি এয়ারপোর্টে থাকব, আজ তো দিনটা সুবিধের নয়।

২৯শে রাতে আমরা বাইরে খেয়ে ফিরছি, রাস্তায় গাড়ি থামাল পুলিশ। গাড়িতে আমরা তিনজন নারী, নন্দনা, শ্রাবস্ত্রী, নবনীতা। প্রচণ্ড বিনয়ের সঙ্গে বারবার ক্ষমা চেয়ে ভালো করে সামনে পিছনে গাড়ি চেক করা হল, "কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আপনাদের দেরি করিয়ে দিচ্ছি, কালকের জন্যে আজ একটু বিশেষ প্রিকশ্যন নিতে হচ্ছে। এমনিতেও, গাড়ির বুট কোথাও আনলক্‌ড রাখবেন না, বুটের মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে রেখে দিতে পারে কেউ।'

দিল্লি থেকে অন্তরা বারবার ফোন করে খবর নিচ্ছে আর বলছে, মা, শুধু শুধু ভেব না, দিল্লিতে সব শান্ত।

টেলিভিশনে একটার পর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে দেখছি, কী বলছে দেশ? কী চাইছে দেশবাসী? সবাই শান্তি চায়। ওপরমহল থেকে ক'দিন ধরেই আবেদন করা হচ্ছে শান্তি রক্ষা করার জন্যে। কারণ অশান্তির উদ্বেগটাই সকলের বুকের মধ্যে। রায় বেরনোর ঠিক আগেই একটা সভাতে যেতে বাধ্য হলুম, সেখানেও একই আবহ। যখন রায় বেরবে তখনও সভা চলবে, তারপর সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসো কী রূপ দেখব শহরের? কী রূপ দেখব দেশের?

অবশেষে রায় বেরল। বানরের পিঠে-ভাগের মতো, ২/১ ভাগ। মানুষ শান্ত আছেন। রায় পছন্দ-অপছন্দ যাই হোক, ভারতের সাধারণ মানুষ আরেকবার প্রমাণ করলেন, আমরা পরিণতমনস্ক, আমরা সুস্থির, আমরা ন্যায়বিচারে, বিচারের অধিকারে বিশ্বাস করি। রায় অপছন্দ হলে সুপ্রিম কোর্টে যাব, লড়াই করব সেখানে, পাশের বাড়ির নিরীহ প্রতিবেশীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব না। এ নিয়ে টিভিতে বারবার নানাজনের (আমিও বাদ নেই) সনির্বন্ধ অনুরোধ, 'আপনারা দয়া করে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখুন'—আমার খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে, কেননা যাঁরা টিভি খুলে বসে আমাদের আবেদন শুনবেন তাঁদের জন্য এই অনুরোধ অপ্রয়োজন। আর যাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কলঙ্কময় অঘটনগুলো ঘটাতে পারেন, তাঁরা টিভির উপদেশ মেনে কাজকম্মো করেন না। অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হয়েই তাঁরা চলতে চান, পথ মনে করে বিপথে। আপনার আমার কাছে জ্ঞান নিয়ে চলতে তাঁদের বয়েই গিয়েছে।

রাম মন্দির বাবরি মসজিদ নিয়ে সেই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯২ সালে। এই বছর ৬ ডিসেম্বর ১৮ বছর পূর্ণ হবে। সেদিন যে শিশু জন্মেছিল, এ বছর সে সাবালকত্ব পাবে আর আমাদের রাজনীতি, আমাদের ধর্মনীতি—এসব কি নাবালক রয়ে যাবে? কেন আমরা মনে করব যে আমাদের দেশবাসী অপরিণামদর্শী হয়ে আজও মারণলীলা চালাবে?

টেলিভিশনে দিল্লির একটি নিউজ চ্যানেলে একটি আলোচনা সভা বসেছিল, পরের প্রজন্মকে নিয়ে। রায় বেরুনোর পরে অযোধ্যা নিয়ে জেন-নেক্সট কী ভাবছে? কিছু ভাবছে কি? প্যানেলে ছ'জন ছেলে মেয়ে, সবাই স্মার্ট, সবারই বক্তব্য ছিল আবছা, রায় নিয়ে কেউ খুব একটা ভাবছে বলে টের পাওয়া গেল না। সঞ্চালক সেটাই উল্লেখ করলেন। তাদের নানা বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ছিল জীবন নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে। কেউ শায়েরি বলছে, কেউ দার্শনিক হচ্ছে, কেউ ছটফট করছে, কেউ স্মার্টনেস প্রদর্শনে ব্যস্ত, কেউ স্বল্পবাক, কেউ

সাবধানী, যাকে বলা হয়, 'নানান ফুলের একটি গুচ্ছ', তাই। সঞ্চালক মনে করলেন মোটামুটি সচেতন ও শিক্ষিত নাগরিক হলেও, তারা কিন্তু অযোধ্যার বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে নিজেকে তেমনভাবে সংযুক্ত মনে করে না। ১৯৯২-তে এরা ছিল শিশু। সকলের দৃষ্টিকোণ যদিও এক ছিল না, কিন্তু সঞ্চালকের শেষ প্রশ্নটি ছিল প্রত্যেকের কাছেই এক। ওই বিতর্কিত জমিতে কী তৈরি হলে তুমি খুশি হবে? কীভাবে জমিটি ব্যবহৃত হোক তুমি চাও?

বেশিরভাগই বললেন পাশাপাশি দু'টি ধর্মের ঠাঁই হোক, মন্দির এবং মসজিদ, আর বাকি জমিতে হোক কোনও ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক স্তরেরও হতে পারে সেই উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে ছাত্রদের ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা দেওয়া হবে। শুনে আমার মনে হল রায় বেরুনোর আগে আমরা যখন বাড়িতে এই নিয়ে উত্তেজিত, ওই বিতর্কিত জমির চমৎকার একখানা জমজমাট সম্ভাব্য ব্যবহারের কথা বলেছিল শ্রাবন্তী। হায় হায়, সেটা দিল্লিবাসী এই অতি আধুনিক তরুণ-তরুণীদের কারও মাথায় এল না? ভাবতে বললে ওদের মনে আসে সেই অচেনা রবীন্দ্রনাথের কাছে না জেনে ধার করা পুরনো ভাবনা—আন্তর্জাতিক, ধর্মনিরপেক্ষ কোনও এক শিক্ষাকেন্দ্রের (যার নাম দেওয়া যেতেই পারে, বিশ্বভারতী!) কথা? আহা, ওরা জানেও না এই চিন্তা এক কবির মাথায় এসেছিল, এবং 'বহুযুগের' ওপারে।

তিরিশ তারিখ দুপুরে দুরুদুরু বক্ষে নন্দনাকে প্লেনে চাপিয়ে দিয়ে এসে টেলিভিশনের সামনে রায়ের জন্যে যখন উৎকণ্ঠ অপেক্ষা করছি, শ্রাবন্তী বললে, 'মা, রায় যাই হোক, আমি কিন্তু একটা বিষ তুলতে আর একটা বিষ সাজেস্ট করতে পারি, এটা গুড, বেটারের চেয়ে ভাল, একেবারে বেস্ট। ২০১০-তে এই সমাধানই শ্রেষ্ঠ, কখনও মার খাবে না। আমি বলি, কমিউনালিজমের বদলে আসুক কনসিউমারিজম।'

'তার মানে?'

আমি তো বোকাসোকা মা। বুঝিনি কী বলতে চাইছেন জেন-নেক্সট। আমাকে সে যা বোঝাল, সেই ভাবনাটা এবারে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে যাক। শ্রাবন্তী বললে :

—'ওখানে একটা মল হোক।'

—'ম-ল?'

—'হ্যাঁ, মল, 'দ্য মল অফ অল রিলিজিয়ন্স'। সর্বধর্মসমন্বয়ে বিগ বাজার। মল-এর মধ্যে সবরকমের দোকান থাকে তো? এইখানে তেমনি বিশাল এক ছাদের নীচে বহুতল বাজার বসবে। স-ব ধর্মের জন্য আলাদা করে এরিয়া চিহ্নিত থাকবে। এক এক ফ্লোরে এক এক ধর্ম। লিফ্‌ট থাকবে, এক্সেলেটর থাকবে, ঘুরে বেড়ানোর সুশ্রী জায়গা, ফোয়ারা, ফুলের দোকান, কফি শপ থাকবে, মসজিদ, বিভিন্ন হিন্দু মন্দির, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন্য মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির, জেন বৌদ্ধদের মন্দির, অস্পৃশ্যদের দেবদেবীদের মন্দির, শিখ গুরুদ্বোয়ারা, ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির, ইহুদি সিনাগগ, ক্যাথলিক গির্জা, প্রোটেস্টান্ট গির্জা, আর্মেনিয়ান গির্জা—আর মাথায় আসছে না, কিন্তু আরও তো অসংখ্য কম জানা ধর্ম আছে, সকলের জন্য স্থান হবে এই পুণ্যস্থানে। ফুলের দোকান, ফল মিষ্টির, ধূপধুনো মোমবাতির দোকান, আর ঘাসের পার্ক থাকবে এখানে-ওখানে, একটা নিরাপদ স্পিকার্স কর্নার থাকবে, সেখানে সবাই এক একটা টাইম বুক করে নিয়ে নিজের নিজের ধর্ম প্রচার করতে পারবে নির্ভয়ে। কেউ বিঘ্ন ঘটাবে না। প্রহরা থাকবে। সবার মন্দিরে নিজস্ব প্রার্থনাসভা থাকবে, কোনও অঞ্চলে গেলে কীর্তন শুনতে পাবে, কোথাও গেলে আজান শুনবে, কোথাও ভজন, কোথাও ক্যারল, হিম্‌স। সবার আলাদা আলাদা অঞ্চল নির্দিষ্ট থাকবে, সব ধর্মের দোকান থাকবে, সেইখানে সেই ধর্মের সব কিছু থাকবে। তার ধর্মগ্রন্থ, তার পুজো-আচ্চার জিনিস, একটা পাড়ার দোকানে পাবে, এই ধরো, দেবদেবীদের মূর্তি, প্রদীপ, ঘট, কোশাকুশি, নামাবলি, গীতা, পুরোহিতদর্পণ, আবার আরেক জায়গায় নমাজের মাদুর, তসবি, মালা, কোরান, হাদিস, ফেজ, হিজাব, আবার কোথাও পাবে ধরো, তোরা, ডেভিডের তারকা, নিরাময়ের চোখ, বিপদভঞ্জন পাঞ্জাছাপ, কোথাও বাইবেল, জপমালা, মোমবাতি, ক্রুশবিদ্ধ যিশু, মেরিমাতার মূর্তি, এইরকম আর কী। যার-যার তার-তার, কিন্তু পাশাপাশি। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের একটা নিজস্ব জোরের জায়গা গড়ে উঠবে একই ছাদের নীচে বেশ, বিশা-ল একটা স্মার্ট, সুন্দ-র 'মল'। হ্যাঁ মা, ভালো হবে না?'

মোটকু ছোট নিজের আইডিয়াতে নিজেই মুগ্ধ।

বিমোহিত তো আমিও।

—'আরে, ছোট, রায় বেরুনোর আগেই তুই ঝট করে ভাবলি কেমন করে এমন একটা চমৎকার জিনিস? এমন সময়োপযোগী এবং সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান! তোকেই তো ওরা বসালে পারত বেঞ্চে! চল চল আমরা কনসেপ্টটা বিক্রি করি টাটাকে। শিগগিরি একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করে ফ্যাল দিকিনি? দারুণ হবে। আবার সেই সব বিভিন্ন ধর্মের পাড়ায় পাড়ায় সকলেরই নিজস্ব রেস্তোরাঁ থাকবে, যে অঞ্চলে তুমি যাবে, সেই ধর্মের চেনা সুগন্ধ বেরুচ্ছে, তার বিশেষ খাদ্যদ্রব্য পাবে। কোথাও বিফ নেই, আবার কোথাও পর্ক নেই, কোথাও দু'টোই আছে, কোথাও বা কোনও আমিষই নেই। কোথাও লুচি মোহনভোগ, কোথাও বিরিয়ানি, কোথাও সুশি, কোথাও স্টেক। ইস, ভেবেই জিবে জল এসে যাচ্ছে, কী

অসামান্য হবে রে? ভালো করে চোখ ধাঁধিয়ে, প্রাণ কাঁপিয়ে, জমিয়ে দাঁড় করাতে পারলে এটা কি ব্যাপকভাবে টুরিস্ট আকর্ষণ করবে না? হাইয়েস্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নার হয়ে যাবে। তাজমহলকে অনায়াসে হার মানিয়ে দেবে অযোধ্যা। মাল্টি কলচারাল তীর্থস্থান।'

বেটি দারুণ ভেবে ফেলেছে, সত্যি, এই সাজেশন শ্রেষ্ঠ না হয়ে যাবে কোথায়? 'মল'-এরই তো যুগ এটা, এবং মাল্টি-কালচারের যুগ। ধর্ম নিরপেক্ষতা কেনা-বেচার 'মল' হোক না একখানা? রায় যা-ই হোক, আলাপ আলোচনার তো জায়গা সর্বদাই থাকে।

এই বহুনিন্দিত অযোধ্যায় ভারতের সংবিধানের ধর্মীয় আদর্শ সশরীরী হয়ে উঠবে। সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন জায়গা মাত্র একটাই থাকবে, শুধু ভারতবর্ষে। এখানেই একে মানায়, আমাদের দেশের ইতিহাসে, ভারতীয় সংস্কৃতির চরিত্রে, আমাদের সংবিধানের জন্যে ব্যবস্থা আছে। ধর্মের বিগ বাজার তো এদেশেই সম্ভব। সত্যি সত্যি সব মানুষের হৃদয়স্পর্শী পুণ্যভূমি হয়ে উঠুক না এই বিতর্কিত ভূখণ্ড। সব ধর্ম যেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কেউ কারুর বেড়া ডিঙোতে আগ্রহী নন।

অযোধ্যাতে এবার কমিউনালিজম আউট, কনসিউমারিজম ইন! মানুষকে সামনের দিকে পরিচালিত করতে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে তো বাণিজ্যই ঢের বেশি পাওয়ারফুল ফোর্স!

এবারে এই নয়া 'ধর্ম-তলা'-য় জমি কেনার জন্যে সরকার থেকে টেন্ডার ডাকা হোক, এফেক্টিভ বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু হোক। 'দ্য মল অফ অল রিলিজিয়ন্স' গড়তে উচ্চস্তরের শিল্পপতিরা এসে পড়ুক। মা ভৈঃ, এর বেলা কমনওয়েলথ গেমসের মতো ধ্যাষ্টামো, হবে না, ঈশ্বর আল্লারা নিজেরাই এটার দেখাশোনা করবেন।

ভালো-বাসা বাড়ি থেকে এই জরুরি প্রস্তাবটা কীভাবে কোথায় কাকে যে পৌঁছে দিলে কাজ হবে, বলতে পারেন?

৩০.০৯.২০১০

নবনীতা দেব সেন-এর কলামের সংকলন, *ভালো-বাসার বারান্দা*-৩ থেকে এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হল। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং।

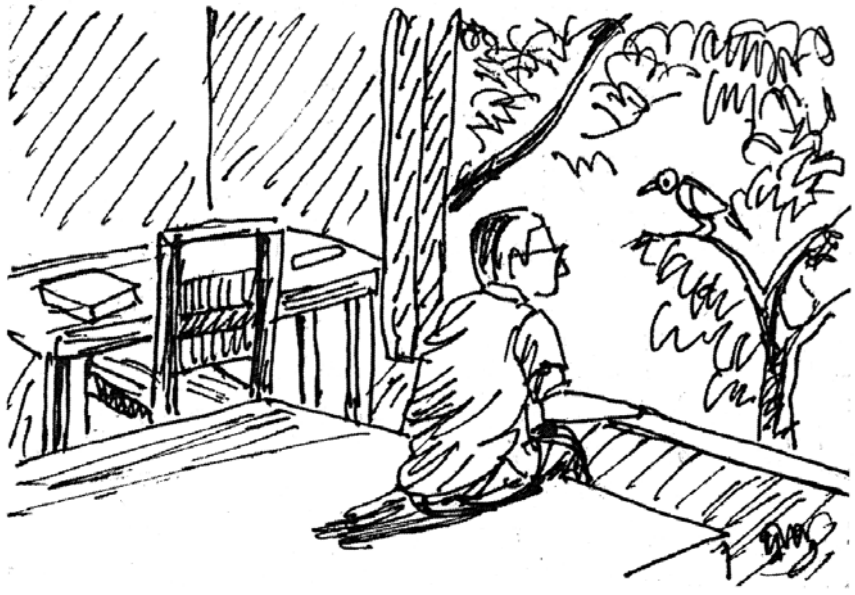

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Issue date 1 December 2019. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 7, Issue 23 Arek Rakam

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ACTIVITY COMMUNITY SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS
- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE
- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY
- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE
- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503
contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.